মনের কথা

শ্রীসরসীলাল সরকার

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্,
কলিকাতা।

সন ১৩১৭ সাল।

ভূমিকা

[ডাঃ শ্রীগিরীন্দ্রশেখর বসু, ডি-এস্‌সি, এম্‌-বি]

ডাঃ সরসীলাল সরকার সুবিজ্ঞ চিকিৎসক। একটা জেলার স্বাস্থ্যের ভার তাঁহার হাতে ন্যস্ত। তিনি সিভিল সার্জ্জন, সুতরাং চিকিৎসা-ব্যাপারে তাঁহাকে কিরূপ ব্যস্ত থাকিতে হয়, তাহা সহজেই অনুমেয়। এত কাজের মধ্যে থাকিয়াও তিনি যে তাঁহার বহুমুখী প্রতিভা মনোবিশ্লেষণে নিয়োজিত করিয়াছেন, ইহা বাস্তবিকই সুখের কথা। মনোবিশ্লেষণ বলিলে সাধারণে যাহা বুঝেন, এ পুস্তকে তাহা নাই। আধুনিক মনোবিদ্যা ক্রমে যে পথে চলিয়াছে, তাহাতে পূর্ব্বে মনোবিদ্যা বলিলে যাহা বুঝাইত এবং এখন যাহা বুঝায়,—এই দু-এর মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ। পূর্ব্বের মনোবিদ্‌গণ বলিতেন, এবং এখনও সাধারণের বিশ্বাস, আমরা যাহা কিছু করিয়া থাকি, তাহার সকল কারণই বুঝি আমরা জানি; কাজেই কোন্ কাজটি কেন করিলাম, তাহার বিশ্লেষণ সোজা;—কিছুক্ষণ চুপ করিয়া চক্ষু বুঁজিয়া বসিলেই বুঝি কারণগুলি আপনি ধরা পড়ে। এই হিসাবে মনোবিশ্লেষণ অবশ্য খুবই সোজা। প্রায় ৩০ বৎসর হইতে চলিল অষ্ট্রিয়া দেশের ভিয়েনা নগরের অধিবাসী ডাঃ সিগ্‌মুণ্ড ফ্রয়েড মানসিক ব্যাধির প্রতিকার-পন্থা অনুসন্ধান করিতে করিতে মনোজগতের কতকগুলি অত্যাশ্চর্য্য রহস্য আবিষ্কার করেন। এই আবিষ্কারের ফলে মনোবিদ্যা পুরাতন

পথ ছাড়িয়া এখন নূতন পথে চলিতে সুরু করিয়াছে। ফ্রয়েড বলেন, আমরা যে কেবল জানা-ইচ্ছার বশেই অনেক সময় কাজ করি তাহা নহে ;—অনেক ইচ্ছা অজানা থাকিয়াও আমাদিগকে কার্য্যে নিয়োজিত করে। এই ধরণের ইচ্ছার অস্তিত্ব আমরা সহজে ধরিতে পারি না। যখনই সামান্য কারণে কাহারও উপর চটিয়া উঠি, অথবা বিনা কারণে কিছু করিয়া বসি, তখনই বুঝিতে হইবে, অজ্ঞাতসারে কোন ইচ্ছা আমাদিগকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। আমাদের বিভিন্ন কার্য্যের বিচার করিয়া, ফ্রয়েডের অনুষ্ঠিত প্রণালীর সাহায্যে এই-সকল অজ্ঞাত ইচ্ছার স্বরূপ ধরা পড়ে। অজ্ঞাত ইচ্ছা ধরিবার চেষ্টাকে ইংরাজীতে Psycho-analysis বলে। এই প্রক্রিয়া সাধারণ মনোবিশ্লেষণ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এইজন্য ইহাকে মনোবিশ্লেষণ না বলিয়া মনোব্যাকরণ বলিব। মনোব্যাকরণের সাহায্যে মানসিক জগতের বহু অভিনব তত্ত্ব জানা সম্ভবপর হইয়াছে। ফ্রয়েডের নির্দ্দিষ্ট পথ যে কত নূতন জ্ঞানলাভের সহায়তা করিয়াছে, তাহা বলা যায় না। স্বপ্নতত্ত্ব, ধর্ম্মতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, শিল্পকলা, রসতত্ত্ব, ইত্যাদি নানা বিষয়ের রহস্য এই উপায়ে ক্রমেই ধরা পড়িতেছে। মনোব্যাকরণ মনোব্যাধির চিকিৎসায় যুগান্তর আনিয়াছে। সরসীবাবু সরসভাবে কতকগুলি মনোব্যাপারের রহস্য এই পুস্তকে বিবৃত করিয়াছেন। কি করিয়া আমাদের অজ্ঞাত ইচ্ছাগুলি আমাদিগকে নানাভাবে চালিত করে, সরসীবাবুর প্রবন্ধগুলিতে পাঠক তাহার কিঞ্চিৎ আভাষ পাইবেন।

মনোব্যাকরণের দ্বারা দেখা গিয়াছে যে মনের নানা স্তর আছে। কোন ইচ্ছা মনের উপরের স্তরেই থাকে, ইহার অস্তিত্ব সহজেই জানা যায়; কোনটি আরও একটু নীচের স্তরে থাকায় ধরা কিছু কঠিন; কোনটি বা মনের অতি গভীর প্রদেশে থাকায় বিশেষ প্রক্রিয়ার সাহায্য ব্যতিরেকে ধরা যায় না। মনোবিদ্‌গণ বলেন, যে-সকল ইচ্ছা সামাজিক-হিসাবে অবৈধ, অন্যায় বা ঘৃণ্য, তাহা আমাদের মনে সহজেই ফুটিতে পায় না;—কোন কারণে ফুটিলেও আমরা প্রায়ই সেরূপ ইচ্ছাকে মনের অন্তঃস্তলে নির্ব্বাসিত করি। এই নির্ব্বাসিত ইচ্ছাগুলি আমাদের অজ্ঞাতে মনের মধ্যে রুদ্ধ অবস্থায় থাকে—ইহাদের বিনাশ নাই। ইচ্ছাগুলি অজ্ঞাত থাকায় আমাদের মনে যে কত কুচিন্তা লুক্কায়িত থাকে, আমরা সহজে তাহার ধারণাই করিতে পারি না। এই অজ্ঞাত রুদ্ধ ইচ্ছাগুলি সুযোগ পাইলেই আত্মপ্রকাশের চেষ্টা করে এবং আমাদিগকে তদনুযায়ী কার্য্যে চালিত করে। কিন্তু রুদ্ধ ইচ্ছাগুলি অবিকৃত অবস্থায় প্রকাশ পাইলে পুনর্নির্ব্বাসনের সম্ভাবনা আছে বলিয়া তাহারা নানা ছদ্মবেশে দেখা দেয়। তখন আমরা তাহাদের স্বরূপ বুঝিতে পারি না; কাজেই তাহাদের কার্য্যেও বাধা দিই না। এইরূপেই রুদ্ধ ইচ্ছাগুলি চরিতার্থতা লাভ করিয়া থাকে। আমাদের মধ্যে খুন করিবার ইচ্ছা আছে,—একথা শুনিলে অনেকে হয় ত বিশ্বাস করিতে চাহিবেন না, কিন্তু এই ইচ্ছাই ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া আমাদিগকে যুদ্ধবিগ্রহে নিয়োজিত করে, আমরা ভাবি বুঝি দেশের জন্যই যুদ্ধ করিতেছি; আমাদিগকে জীব-হত্যা করিতে

প্রবুদ্ধ করিলে আমরা মনে করি—আহারের জন্যই বুঝি আমরা কেবল ছাগল কাটি।

ভিন্ন ভিন্ন স্তরের ইচ্ছাগুলির প্রকৃতিও ভিন্নরূপ। যেটি অপেক্ষাকৃত উপরের, সেটি নীচের ইচ্ছার তুলনায় সামাজিক হিসাবে কম অন্যায়, এবং যেটি নিম্নস্তরের তাহা অতীব দূষণীয়। মনোবিদেরা বলেন, অতি গভীর স্তরের ইচ্ছাগুলি প্রায়ই কামজ। এই ইচ্ছার স্বরূপ-নির্ণয় মনোব্যাকরণের একটি দুরূহ ব্যাপার। কিন্তু এরূপ চেষ্টা সাধারণ পাঠকের রুচিকর হইবে না বলিয়াই সরসীবাবু তাহাতে হস্তক্ষেপ করেন নাই। অপেক্ষাকৃত উপরের স্তরের অজ্ঞাত ইচ্ছাগুলি লইয়াই তিনি এই পুস্তকে আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার বর্ণনা সরল অথচ মনোজ্ঞ। পাঠক এই পুস্তকের সাহায্যে মনোবিদ্যার রহস্য বুঝিবেন, সঙ্গে সঙ্গে আনন্দ উপভোগ করিবেন।

নিবেদন

মনস্তত্ত্বের রহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্য—মনোজগতের গূঢ়স্তরের ভাবরাশির বিশ্লেষণের যে নব বৈজ্ঞানিক প্রণালী আবিষ্কৃত হইয়াছে, এই পুস্তকে তাহারই অনুসরণে—উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করা হইয়াছে। নূতন মনস্তত্ত্ব-বিজ্ঞানের আলোচনা দ্বারা উহার মূলনীতি বুঝাইবার চেষ্টা করি নাই; কেবল উদাহরণের সাহায্যে যথাসম্ভব চিত্তাকর্ষক করিয়া এই নব-ভাবের মনোবিশ্লেষণ-প্রণালীর ভাবটি বুঝাইবার প্রয়াস পাইয়াছি। আশা করা যায়, ইহাতে সাধারণের পক্ষে ভাবগ্রহণের সুবিধা হইবে।

এই নব মনস্তত্ত্ব-প্রণালীতে বৈজ্ঞানিকভাবে একটি বিশেষ সত্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। অধিকাংশস্থলেই মানসিক ব্যাধি-সমূহের নিদান মূলকারণে কামপ্রবৃত্তি ঘটিত নানাবিধ ভাব-বিকারই লক্ষিত হয়। ইহা ব্যতীত এই নবাবিষ্কৃত মনস্তত্ত্বের আরও অনেক বিষয়ের সহিত মানব-মনের এই গূঢ়স্তরের ভাব-রাশির সংযোগ দেখান হইয়াছে; যেমন পৌরাণিক উপন্যাস, চলিত গল্প, শিল্প, কলাবিদ্যা, রূপকথা, কবিতা, সামাজিক রীতি-নীতি, পারিবারিক রীতি-নীতি, নানা সংস্কার, ঠাট্টা-তামাসা ধরণ-ধারণ, ইত্যাদি। স্বপ্নজগতের ঘটনার সমস্তটাই এই গূঢ়স্তর হইতে উদ্ভূত।

নব মনস্তত্ত্বে কামঘটিত বিষয়ের আলোচনাতে অনেকে অসন্তুষ্ট হইতে পারেন, কিন্তু চিকিৎসাশাস্ত্রে এ সব বিষয় কেবল বাস্তবতা ও কার্য্যকারিতার দিক দিয়াই দেখা হয়। শরীরের গভীরতমস্থল হইতে প্রদাহ উৎপত্তি হইলে সুদক্ষ অস্ত্র-চিকিৎসক যেমন অস্ত্রোপ্রচারে তাহা নিরাময় করেন, ইহাও অনেকটা সেইরূপ। হিন্দুশাস্ত্রে আত্ম-বিচারের প্রয়োজনীয়তার কারণও অনেকটা ইহাই। পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার একখানি গ্রন্থে মনের এইভাবের গতি পর্য্যবেক্ষণ-বিষয়ে বলিয়াছেন :—দ্রষ্টার মতন মনের গতি দেখে যাবে। দেখতে দেখতে তোমার মনের হয়তো তোমার কাছে এমন ভাব ধরা পড়ে যাবে, যা ভাবতেও তুমি ঘৃণায় শিউরে ওঠ।—বৈজ্ঞানিক গ্রন্থে যেরূপ নগ্নরূপে কাম-ভাবের আলোচনা করা সম্ভবপর হয়, সাহিত্যক্ষেত্রে তাহা হয় না। এই গ্রন্থে কামভাবঘটিত উদাহরণ পরিত্যক্ত হইয়াছে।

পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ মানব-মনের এই গম্ভীর স্তরের ভাব কাম ও এইরূপ নিম্নপ্রবৃত্তির বিকারের ভিতর দিয়াই বর্ত্তমানে গবেষণা করিতেছেন বটে, কিন্তু ইহাও তাঁহারা স্বীকার করিতেছেন যে, এ-সম্বন্ধে আলোচনায় কতক কতক সত্য আবিষ্কার করিতে পারিলেও এখনও অনেক সত্য নির্দ্ধারণ করিবার আছে। মানব-মনের উচ্চতম প্রবৃত্তি—যেমন আধ্যাত্মিকতা (ethical and spiritual conceptions), সমাধিচৈতন্য (mystical consciousness), প্রভৃতি সম্বন্ধে এই মনস্তত্ত্বে কোনও আলো-চনাই হয় নাই। এ বিষয়ে ভারতবর্ষের চিন্তা-ধারা পাশ্চাত্য

চিন্তা-ধারা হইতে ভিন্ন পথগামী। এই নব মনস্তত্ত্বের গতি ভারতবর্ষের চিন্তা-ধারার খাতে প্রবাহিত করিলে হয় ত নূতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইতে পারে, এবং বোধ হয় ভারতবর্ষের এবিষয়ে একটি কর্ত্তব্যও সম্মুখীন হইয়াছে।

বাঙ্গালা ভাষায় নব্য মনস্তত্ত্বের এইখানিই প্রথম গ্রন্থ এবং বিষয়টিও সম্পূর্ণ অভিনব। তদ্ভিন্ন এরূপ গুরুতর বিষয়ের আলোচনা এই ক্ষুদ্র পুস্তকে অসম্ভব, ইহাতে কেবলমাত্র নব মনস্তত্ত্ব-বিজ্ঞানের একটু আভাস দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

মনস্তত্ত্বশাস্ত্র-রসজ্ঞ সুহৃদ্বর ডাক্তার শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রশেখর বসু, এই গ্রন্থ-প্রকাশের ভার গ্রহণ করিয়া আমাকে উপকৃত করিয়াছেন, নতুবা আমার ন্যায় প্রবাসীর পক্ষে গ্রন্থ প্রকাশ করা কঠিন হইত। তিনি এই পুস্তকখানির ভূমিকা লিখিয়া দিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ করিয়াছেন। ভরসা করি, আমার এই মনস্তত্ত্বের গ্রন্থের উদাহরণগুলিতে পাঠক-পাঠিকাগণ যে বিষয়ের আভাস পাইবেন, তাঁহার পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভূমিকা তাহা অধিকতর স্পষ্টভাবে বুঝিবার সাহায্য করিবে।

সূচি

মনের কথা

মনের ঘাত-প্রতিঘাত

সূক্ষ্ম ঘটনাবলী আমাদের জীবনের অনেক কার্য্যকে এরূপ-ভাবে নিয়ন্ত্রিত করে যে, তাহাদের প্রভাব জীবনের প্রধান ও বিশেষ ঘটনার তুলনায় অনেকস্থলেই অধিক বলিয়া বোধ হয়। বড়-বড় কবি, নাটক ও উপন্যাস-লেখক তাঁহাদের গল্পের নায়ক-নায়িকা প্রভৃতির চরিত্র-বিশ্লেষণের মধ্যে মনের এইরূপ ঘাত-প্রতিঘাত সুনিপুণভাবে অঙ্কিত করিয়া দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। আমাদের দৈনন্দিন ঘটনার দিকে লক্ষ্য করিলে, এই শ্রেণীর বহু দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। সূক্ষ্ম ঘটনার প্রভাব, জীবনের প্রধান ও বিশেষ ঘটনার প্রভাব অপেক্ষা অনেক স্থলে এত অধিক হয় কেন, তাহা চিন্তার ও বৈজ্ঞানিকভাবে আলোচনা করিবার বিষয়।

অধুনা ডাক্তার ফ্রয়েড্ (Dr. Freud), ডাক্তার ইয়ুং (Dr. Jung) প্রভৃতি মনীষিগণ মনস্তত্ত্বের সম্বন্ধে অনেক আশ্চর্য্য আবিষ্কার করিয়া আমাদের মনের ব্যাপারের রহস্য উদ্ঘাটনের একটি নূতন পন্থা দেখাইয়া দিয়াছেন। পূর্ব্বে আমরা মানসিক ক্রিয়া সম্বন্ধে যতটা বুঝিতে পারিতাম, এক্ষণে এই

আবিষ্কারের সাহায্যে তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক বুঝিতে পারি। যাহা হউক, ডাক্তার ফ্রয়েড্ ও ডাক্তার ইয়ুং-এর মনস্তত্ত্বের আলোচনা সম্বন্ধে বিচার করা আমার উদ্দেশ্য নহে। দৈনন্দিন জীবনে মনের উপর সূক্ষ্ম ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের প্রভাবই কতকগুলি দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইবার চেষ্টা করিব। নিম্নে এইরূপ কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি।

(১) খুলনার দুর্ভিক্ষের কথা কাহারও অবিদিত নাই। ডাক্তার পি. সি. রায়ের চেষ্টায় এই দুর্ভিক্ষের অবস্থা জনসাধারণের নিকট প্রচারিত হইয়াছে। অনেককাল পূর্ব্ব হইতেই এই দুর্ভিক্ষ চলিতেছিল। এই দুর্ভিক্ষের জন্য একটি দুঃস্থ লোক উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করে। সকলে বুঝিল—লোকটি খাদ্যের অভাবে মনের দুঃখে আত্মহত্যা করিয়াছে। অবশ্য কথাটি অনেক পরিমাণে সত্য বটে; কিন্তু আত্মহত্যা প্রভৃতি কার্য্যের কারণ সম্বন্ধে কিছু সূক্ষ্মভাবে আলোচনা করিলে, অধিকাংশ স্থলেই একটি স্থূল কারণের অন্তরালে একটি সূক্ষ্ম কার্য্যের প্রভাব উপলব্ধি করা যায়। এস্থলেও বোধ হয় সেইরূপ একটা সূক্ষ্ম কারণ ছিল। ঘটনাটি এইরূপ।

যে লোকটি আত্মহত্যা করে, সে কোনও হিন্দু-পরিবারের উপার্জ্জনক্ষম লোক। ঘরে কিছু সংস্থান নাই দেখিয়া, সে একটি মাদুর বুনিয়া ফেলে। সেই মাদুর এক মহাজনের নিকট বিক্রয়ের জন্য লইয়া যায়। মহাজন অতি অল্প মূল্য ধার্য্য করিয়া

উহা ক্রয় করিল বটে, কিন্তু তাহার অনেক কাঁদাকাটি সত্ত্বেও, নগদ কিছু পয়সা না দিয়া, পূর্ব্বের ধারের বাবদ সমস্ত মূল্যই কাটিয়া রাখে। তখন সে নিরুপায় হইয়া, অন্যত্র ভিক্ষা করিয়া, চাল সংগ্রহ করিয়া বাড়ীতে ফিরিল এবং অন্ন প্রস্তুত করিবার জন্য সেই চাল উনুনে চড়াইয়া দিল। ভাত সিদ্ধ হইতেছে, এমন সময়ে সে শুনিতে পাইল যে, তাহার দুই ভাই আনন্দে গল্প করিতেছে। সর্ব্বকনিষ্ঠ ভাইটি বলিল যে, আজ সে পেট পূরিয়া ভাত খাইবে। অপর ভাই বলিল যে, পেট পূরিয়া ভাত খাওয়া হইবে কি করিয়া? এই ভাত ত সকলের ভাগ করিয়া খাইতে হইবে। এই কথা শুনিয়াই তাহাদের বড় ভাই (যে চাল সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল) বাহিরে চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল, সে উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করিয়াছে।

এখন তাহার উদ্বন্ধনের কারণ সম্বন্ধে চিন্তা করা যাউক। আমাদের বোধ হয় লোকটি যে ঠিক অন্নাভাবে আত্মহত্যা করিয়াছে, তাহা নহে। কারণ, ভবিষ্যতে তাহাদের ভাগ্যে যাহাই থাকুক, উপস্থিত কিছু অন্ন ত তাহাদের জন্য প্রস্তুতই হইতেছিল। মহাজনের নিকট মাদুর বেচিতে গিয়া যে ব্যবহার সে তাহার নিকট পাইয়াছিল, সে কথা কাঁটার মত তাহার হৃদয়ে বিঁধিয়া ছিল। সে যখন অতি ক্ষুধার্ত্ত, তখনই সে মাদুর লইয়া মহাজনের শরণাপন্ন হয়। মহাজন মাদুরের মূল্য না দিয়া, তাহাকে একপ্রকার মুখের অন্নের গ্রাস হইতে বঞ্চিত করিয়াছিল।

কারণ, এই মাদুরের মূল্য ভিন্ন তখন লোকটির অন্য সংস্থান ছিল না। যখন তাহার সর্ব্বকনিষ্ঠ ভাই পেট পূরিয়া খাইবার ব্যবস্থা করিতেছিল, এবং আর এক ভাই তাহার এই সুখের চিন্তায় বাধা দিয়া বুঝাইয়া দিল যে, সকলের খাইতে হইলে পেট পূরিয়া খাইবার সম্ভাবনা নাই,—তখনই সেই মহাজনের অতি নৃশংস ব্যবহার তাহার স্মৃতিপথে পুনরায় জাগিয়া উঠিয়াছিল, এবং তাহার মনে হইয়াছিল—"আমিও কি ছোট ভাইটির প্রতি ঠিক মহাজনের মতই ব্যবহার করিতেছি না? তাহার মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইতেছি না? আমি যদি এই অন্নের ভাগ না লই, তাহা হইলে ত ইহার মনের ইচ্ছা পূরণ হইতে পারে।" ফলতঃ, সেই মহাজনের ব্যবহার তাহার নিকট এরূপ ঘৃণ্য ও বীভৎস বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছিল যে, সে মনে করিল, এইরূপ করা অপেক্ষা প্রাণত্যাগ শ্রেয়ঃ; এবং কার্য্যতঃ সে তাহাই করিয়াছিল।

যদিও আইনমতে ঐ মহাজন লোকটির মৃত্যুর জন্য কোনও-রূপে দায়ী নহে,—তবুও বোধ হয় বিধাতা-পুরুষ—যিনি সকলের কর্ম্মের বিচার করিয়া ফল ভাগ করিয়া দেন—তিনি এই নরহত্যার জন্য মহাজনকে দোষী না করিয়া থাকিতে পারিবেন না।

(২) অনেক দিন পূর্ব্বের ঘটনা। তখন ঢাকার নবাব-সাহেবের একজন সাহেব ম্যানেজার ছিল। যে কোনও কারণেই হউক, কোন এক দুর্ব্বৃত্ত, দুঃস্বভাব মুসলমান এই সাহেব-ম্যানেজারের প্রিয়পাত্র হইয়াছিল। এই মুসলমানটি এক

নির্জ্জন স্থানে একটি লোককে দা দিয়া কাটিয়া খুন করে। ঘটনাচক্রে হঠাৎ সেই স্থলে আর একজন লোক আসিয়া উপস্থিত হইয়া, ব্যাপার দেখিয়াই চমকিত হয়। এই দুর্ব্বৃত্তটি তাহার মাথায় দা'য়ের একটি আঘাত করিয়াই পলাইয়া যায়। আহত লোকটি অর্দ্ধমৃত অবস্থায় তথায় পড়িয়া থাকে। এই ঘটনা লইয়া ঢাকা সহরে হুলস্থূল পড়িয়া যায়।

আহত ব্যক্তিটিকে হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য আনা হইলে, ঢাকার কয়েকজন বিশিষ্ট লোক সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবকে বলেন যে, ইহাকে হাসপাতালের সাধারণ ওয়ার্ডে রাখা নিরাপদ নহে। কারণ, লোকটি সুস্থ হইয়া উঠিলে, খুনী মোকর্দ্দমার একজন প্রধান সাক্ষী হইবে। সুতরাং যখন একপক্ষের স্বার্থ এই লোকটি না বাঁচে, তখন, এরূপস্থলে ইহাকে হাসপাতালে সাধারণ রোগীদের মধ্যে রাখা নিরাপদ নহে। ইহা শুনিয়া সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব আহত ব্যক্তিটির জন্য পৃথক্ ঘরের ব্যবস্থা করেন; এবং একজন প্রবীণ ডাক্তার ও জনকয়েক ছাত্র নির্ব্বাচন করিয়া নিয়ম করিয়া দেন যে, এই ডাক্তার ও নির্ব্বাচিত ছাত্রগণ ভিন্ন আর কেহই তাহার ঘরে যাইতে পারিবে না। ছাত্রদের মধ্যে দুইজন কিংবা একজন করিয়া duty-মত তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া, সেবা-শুশ্রূষাদি যত্নসহকারে করিবে।

এইরূপ নিয়মে কিছুদিন অতিবাহিত হইল। আহত ব্যক্তিটির জীবনের আশা খুব অল্প থাকিলেও, সেবা-শুশ্রূষার গুণে সে

ক্রমে ক্রমে সুস্থ হইয়া উঠিতে লাগিল। এমন সময়ে একদিন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের অনুপস্থিতকালে ঢাকার নবাব-সাহেবের সাহেব ম্যানেজার, পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের সহিত হাসপাতালে আসেন। তখন একজন মিলিটারি এসিস্ট্যাণ্ট সার্জ্জন এবং দেশীয় সব্-এসিস্ট্যাণ্ট সার্জ্জন হাসপাতালের dutyতে ছিলেন। পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও নবাব-সাহেবের ম্যানেজার মিলিটারি এসিস্টাণ্ট সার্জ্জনকে বলেন যে, তাঁহারা মোকর্দ্দমার তত্ত্বাবধানের জন্য আহত ব্যক্তিটির সহিত দেখা করিতে ইচ্ছা করেন। গোরা ডাক্তারটি দেশীয় ডাক্তারের সহিত এই সাহেব-দুটিকে আহত ব্যক্তিটির সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য পাঠাইয়া দেন। রোগীর কক্ষে সাহেবদ্বয় ঢুকিবার চেষ্টা করিলে, যে ছাত্র সেই ঘরে dutyতে ছিল, সে এই বলিয়া আপত্তি করে যে, এই ঘরে অন্য কাহাকেও প্রবেশ করিতে দেওয়ার আদেশ নাই এবং সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের হুকুম না পাইলে সে কাহাকেও ঘরে ঢুকিতে দিতে পারে না। এই কথা শুনিয়াও সেই সাহেবদ্বয় ঔদ্ধত্য প্রকাশপূর্ব্বক জোর করিয়া ঘরে ঢুকিবার চেষ্টা করাতে, সেই ছাত্রটি (যাহার বাড়ী ঢাকা অঞ্চলে ও যে নিজেও বেশ বলশালী) একরূপ জোর করিয়া প্রায় গলাধাক্কা দিয়া সাহেব দুইটিকে বাহির করিয়া দিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দেয়। সাহেবরা ক্রুদ্ধ হইয়া ছাত্রটিকে শাসাইয়া চলিয়া যান। দেশীয় ডাক্তারটিও এই ছাত্রের ব্যবহারে স্তম্ভিত ও বিরক্ত হইয়া

গোরা ডাক্তারটিকে খবর দেন। তিনিও আসিয়া এক পত্তন শাসাইয়া গেলেন। কিন্তু, ইহা সত্ত্বেও সেই ছাত্রটি রাত্রি আটটা পর্য্যন্ত দরজা বন্ধ করিয়া রাখে। আটটার সময় তাহার duty শেষ হইলে সে মেসে ফিরিয়া যায়। মেসের ছাত্রগণ সমস্ত ঘটনা শুনিয়া বলিতে লাগিল, তাহার এই কার্য্যের জন্য পরদিন তাহাকে অনেক দুঃখ ভোগ করিতে হইবে, ইত্যাদি। ছাত্রদের এইরূপ নানা কথায় উত্ত্যক্ত হইয়া, সে মেস ছাড়িয়া বাহির হইল।

ঢাকায় তখন একদল নূতন থিয়েটার আসিয়াছিল। থিয়েটারে আসিয়া ছাত্রেরা গোলমাল করে বলিয়া, ঢাকার কমিশনার এক কড়া হুকুম জারি করেন যে, যে ছাত্র থিয়েটারে যাইবে, তাহাকে স্কুল কিংবা কলেজ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হইবে। ছাত্রদের থিয়েটারে যাইয়া গোলমাল করিবার উদ্দেশ্য ছিল এই যে, অসচ্চরিত্রা স্ত্রীলোকদের দ্বারা অভিনীত থিয়েটার যাহাতে ঢাকায় প্রচলিত না হয়, তাহারই চেষ্টা করা। ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্রটি মেস হইতে বাহির হইয়া, বাজারে গিয়া একটি মুসলমানের টুপি ও লুঙ্গি কিনিল। তারপর, এই লুঙ্গি ও টুপি পরিয়া, মুসলমান সাজিয়া, সে থিয়েটার দেখিতে গেল।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, হঠাৎ এই ছাত্রটির থিয়েটার দেখিবার ইচ্ছা হইল কেন? থিয়েটারে যাইবার সময়ে সে মুসলমান সাজিয়াই বা গেল কেন? এসব কার্য্য তাহার মনের

অন্তস্তল হইতে ঘটিয়াছিল; এবং সম্ভবতঃ এই কার্য্য-কারণের সম্বন্ধ সে নিজেও বিশেষভাবে বুঝে নাই। কিন্তু, এ সম্বন্ধে মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া কিছু-কিছু বিশ্লেষণ করা যাইতে পারে।

ছাত্রটি প্রথমতঃ হাসপাতালে বড়-বড় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে কর্ত্তব্যানুরোধে দণ্ডায়মান হইয়াছিল। হাসপাতালের বাহিরে আসিয়াও তাহার এই তেজই (spirit) দেখিতে পাওয়া যায়। ছাত্রটি সেইজন্য থিয়েটার দেখিবার বিষয়েও কর্তৃপক্ষগণের আদেশ অমান্য করিল; এবং অন্যান্য ছাত্রদের থিয়েটার না দেখার সম্বন্ধে মতেরও বিরুদ্ধাচরণ করিয়া থিয়েটার দেখিতে গেল। তাহার সঙ্গী ছাত্রদের মতের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া সে বুঝাইল যে, তাহাদের মতের সঙ্গে তাহার নিজের মতের মিল নাই। এই থিয়েটার দেখাকে অন্য সকল ছাত্র যেরূপ খারাপ কাজ বলিয়া মনে করে, সে তাহা করে না। এ সম্বন্ধে অন্যান্য ছাত্রের মত হইতে তাহার মত স্বতন্ত্র।—তাহারা ভয় করিয়া যাহা করিতে চায় না, সে তাহা করিতে প্রস্তুত।

অবশ্য, এই ছাত্রটি মুসলমান সাজিয়া থিয়েটার দেখিতে গিয়াছিল। এই কার্য্যে যে আত্মগোপনরূপ হীনতার ভাব ছিল, তাহাতেও কোন সন্দেহ নাই। আবার এই মুসলমান-সাজার মধ্যে একটা আত্মম্ভরিতার ভাবও ছিল। ঢাকার ম্যানেজার সাহেবের মনিব মুসলমান। ছাত্রটি মুসলমান সাজিয়া এই প্রতিপন্ন করিতে চাহিল যে, আমিও মুসলমান সাজিয়া

তোমার মনিবের সমশ্রেণীর লোক হইতে পারি। সুতরাং আমি তোমাকে গ্রাহ্য না করিয়া, তোমার উপর হুকুম চালাইতেও পারি। বাঙ্গালীদের সাহেব-সাজার মধ্যে এই উভয় প্রকার ভাবই থাকে; এবং এই ভাবগুলি বাঙ্গালীদের বোধ হয় মজ্জাগত হইয়া গিয়াছে।

(৩) মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান ও ভাইস্-চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত হইবে। তজ্জন্য মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনারগণের সভা হইয়াছে। এই মিউনিসিপ্যালিটির একটু পূর্ব্ব ইতিহাস বলা যাইতে পারে। কিছুদিন পূর্ব্বে যখন শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় আসিয়াছিলেন, তখন মিউনিসিপ্যালিটি হইতে তাঁহাকে অভিনন্দন-পত্র দেওয়া হয়। নূতন নির্ব্বাচনে আর যাহাতে এরূপ ঘটনা না ঘটে, সেইজন্য officials এবং co-operatorদের ইচ্ছা যে, তাঁহাদের মধ্য হইতেই মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান ও ভাইস্-চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত হন। অবশ্য non-co-operatorদের ইচ্ছা অন্যরূপ। প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে একজন non-co-operator চেয়ারম্যান ও অপর একজন ভাইস্-চেয়ারম্যান পদের জন্য উপস্থিত ছিলেন। প্রথমে চেয়ারম্যান নির্ব্বাচন হইয়া গেল।

Non-co-operatorদের মধ্যে যিনি চেয়ারম্যানের পদপ্রার্থী ছিলেন, তাঁহার সম্বন্ধে স্থানীয় পত্রিকায় 'জনপ্রিয়' প্রভৃতি নানা সুখ্যাতি বাহির হইলেও, তিনি ভোটে হারিয়া গেলেন। একজন co-operatorই চেয়ারম্যান হইলেন, এবং ভাইস্-চেয়ারম্যান

নির্ব্বাচনের সভায় তিনি চেয়ারম্যান হইয়া বসিলেন। তাহার পর ভাইস্-চেয়ারম্যান নির্ব্বাচনের পালা। Non-co-operatorদের মধ্যে যিনি ভাইস্-চেয়ারম্যানের পদপ্রার্থী ছিলেন, তাঁহার বিশেষ ভরসা ছিল যে, তিনি নিশ্চয়ই এই পদ পাইবেন।

ভোটের কাগজগুলি উপস্থিত সভ্যগণের নিকট হইতে লওয়া হইলে দেখা গেল যে, Non-co-operatorদের মধ্যে যিনি ভাইস্-চেয়ারম্যানের পদপ্রার্থী, তিনিও আটটি ভোট পাইয়াছেন, আবার co-operatorদের মধ্যে যিনি ভাইস্-চেয়ারম্যান-পদপ্রার্থী, তিনিও আটটি ভোট পাইয়াছেন। যিনি চেয়ারম্যান হইয়াছিলেন, তিনি তাঁহার casting ভোট দিয়া co-operatorকেই ভাইস্-চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত করিলেন। আঠারজন মিউনিসিপ্যাল সভ্য উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে আটজন করিয়া ষোলজনের ভোটের হিসাব হইল। আর দুইজন কিরূপভাবে ভোট দিলেন, তাহা দেখিবার জন্য অনেকেই উৎসুক হইলেন। দেখা গেল যে, একজন কেবল মাত্র সাদা ভোটের কাগজ দিয়াছেন, আর এক-জন হিজি-বিজি লিখিয়া, কোনও নাম না লিখিয়া—ভোটের কাগজ দিয়াছেন। এই দুইটি ভোটের কাগজ বাহির হইবার পরই, যিনি Non-co-operatorদের মধ্যে পদপ্রার্থী ছিলেন, তিনি সভার মধ্যে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহাকে সভার মধ্যে শোওয়াইয়া, মাথায় জল দিয়া, ও ঔষধাদি খাওয়াইয়া সচেতন করা হইলে, পাল্কী করিয়া বাড়ী পাঠান হইল।

ইহার পর, একদিন এই ভদ্রলোকটির সহিত লেখকের সাক্ষাৎ। তাঁহার মূর্চ্ছিত হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে, এই ভদ্রলোকটি কিছু ব্যঙ্গ করিয়া উত্তর দেন যে, আপনারা আমাকে unfit স্থির করিয়াছেন ; কিন্তু আমি যে fit, তাহা ফিট্ হইয়াই দেখাইয়া দিলাম। মনস্তত্ত্বের হিসাবে এরূপ ব্যাখ্যাও অগ্রাহ্য নহে। দুই-একজন ভদ্রলোকের নিকট শুনিয়াছি যে, দুইজন ভোট দেন নাই (যদিও তাঁহাদের নাম স্থিরভাবে জানা যায় নাই ; কারণ, ভোটের কাগজগুলি তখনই ধ্বংস করা হয়), তাঁহাদের মধ্যে একজন এই Non-co-operator প্রার্থীর হয় ত বিশেষ বন্ধু ছিলেন , এবং তাঁহাকে নির্ব্বাচন ব্যাপারে বিশেষভাবে উৎসাহিত করিয়াছিলেন।

জুলিয়াস সিজারকে সেনেটের মধ্যে খুন করিবার জন্য, যখন সেনেটের কতকগুলি মেম্বার তাঁহাকে আক্রমণ করে, তখন তিনি প্রথমতঃ আত্মরক্ষার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু, যখন তাঁহার অতি প্রিয়বন্ধু Brutusও তাঁহাকে ছুরির আঘাত করিল, তখন সেই আঘাতটি তাঁহার বড়ই মর্ম্মান্তিক হইয়াছিল। তিনি তখন— 'Et tu Brute' (কি ব্রুটাস, তুমিও মার) এই কথা বলিয়া তাঁহার গাউনের এক অংশ দিয়া নিজের মুখ ঢাকিয়া ফেলিলেন ; এবং আর আত্মরক্ষার চেষ্টা না করিয়া, আততায়ীদের আঘাতে নিহত হইলেন।

এস্থলেও বোধ হয়, যখন লেখকের নাম-শূন্য দুইটি ভোটের

কাগজ এই বিফল-মনোরথ ভদ্রলোকের চক্ষের সম্মুখে পড়িল,—তখনই তাঁহার মনের মধ্যে, তাঁহার অজ্ঞাতসারে,—ভোটের কাগজে হিজি-বিজি লেখা দেখিয়া,—এরূপ ধারণা হইল যে, এই ভোট না দেওয়া,—ভোট দিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ এমন কোনও বন্ধুর দ্বারা ঘটিয়াছে। এরূপ ধারণাকে ডাক্তার ফ্রয়েড unconscious mindএর ক্রিয়া বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। এইরূপ ধারণার আঘাত অসহ্য হইলে, সাধারণতঃ কিছুক্ষণের জন্য স্বাভাবিক জ্ঞান লুপ্ত হইয়া, ধারণার কষ্ট হইতে অব্যাহতি দেয়। এই ভদ্রলোকটিরও তাহাই হয়। তিনিও মূর্চ্ছিত হইয়া, কিছুক্ষণের জন্য তাঁহার মানসিক কষ্ট হইতে অব্যাহতি পাইলেন।

দৃষ্টান্ত-স্বরূপ এইরূপ আরও অনেক ঘটনা উল্লেখ করা যাইতে পারে; পাঠকগণ যদি তাঁহাদের দৈনন্দিন জীবনের পর্য্যবেক্ষণ হইতে এইরূপ ঘটনা সংগ্রহ করিয়া মধ্যে মধ্যে আলোচনা করেন, তাহা হইলে মনস্তত্ত্বের আলোচনার কতকটা সুবিধা হইতে পারে।

কার্য্যের সংজ্ঞা-জ্ঞাপকতা

আমরা মনের ইচ্ছায় কার্য্য করিয়া যাই; কিন্তু আমাদের মনের গভীর স্তরের ভাবের ইঙ্গিত অনেক স্থলে এই সকল কার্য্যের মধ্যে থাকিয়া যায়। আমাদের মনের গভীর স্তরের ভাবের স্রোত আমরা নিজেরই স্পষ্টরূপে ধরিতে পারি না। কিন্তু ইহা কখন কখনও আমাদের কার্য্যে এরূপ একটি ভঙ্গী দেয় যে, সেই ভঙ্গী ধরিয়া মনস্তত্ত্ববিদেরা অনেক সময়ে মনের গভীর স্তরের ভাবের স্রোতের গতি অনুমান করিতে পারেন। কার্য্যের এই ভঙ্গী কার্য্যকর্ত্তার অজ্ঞাতসারে আসিয়া পড়ে। কার্য্যের এইরূপ ভঙ্গীর দ্বারা ভিতরের মনের অবস্থা কখন কখনও অনুমান করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু তাহা সচরাচর সাধারণ লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। কিন্তু যাঁহারা সংসারে অনেক দেখিয়া-শুনিয়া, মানব-চরিত্র বুঝিবার পক্ষে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা সাধারণ লোক অপেক্ষা লোকের কার্য্যের ভঙ্গী দেখিয়াই, তাহাদের মনের ভিতরকার কথা অনেক স্থলে বুঝিয়া ফেলিতে পারেন। একটি চলিত কথা আছে যে, লোকদের হাঁটিবার ভঙ্গী দেখিয়া, তাহাদের কোষ্ঠি লেখা যায়;—অর্থাৎ তাহাদের ভবিষ্যৎ কার্য্য অনুমান করিয়া লওয়া যায়। এই কথাটি একেবারে নিরর্থক নহে।

মনোবিজ্ঞান শাস্ত্রের গবেষণা দ্বারা আমাদের মনের গভীর স্তরের ভাবের স্রোতের গতি নিরূপণার্থ কতকগুলি প্রণালী আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই প্রণালীগুলিকে মনোবিজ্ঞান শাস্ত্রে psycho-analytical methods বলা হয়। মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণের এই সকল নবাবিষ্কৃত প্রণালী জানা থাকিলে, অনেক সময় মনের গভীর স্তরের ভাবের স্রোত-গতি বুঝিবার পক্ষে অনেকটা সুবিধা হয়। সংসারে অনেক দেখিয়া শুনিয়া যাঁহারা মানব-চরিত্র বুঝিবার পক্ষে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাও মানব-চরিত্র-বিশ্লেষণের জন্য কতকটা এই psycho-analytical methodsই অবলম্বন করেন; অর্থাৎ, তাঁহারা কার্য্যের ভঙ্গীকে সংজ্ঞা ধরিয়া, তাঁহাদের অভিজ্ঞতায় কোন ভিতরের ভাবের স্রোত এইরূপ সংজ্ঞা দ্বারা সূচিত হইয়াছিল, এইরূপ ভাবে বিশ্লেষণ করিতে অগ্রসর হন। একটি সংজ্ঞা অর্থাৎ symbol লইয়া, তাহা কোন্ জিনিসের symbol, এইটি বুঝিবার যেমন চেষ্টা করা যায়, তেমনি কোন একটি কার্য্যের ভঙ্গী লইয়া, তাহা মনের গভীর স্তরের কিরূপ ভাবের স্রোত ইঙ্গিত করিতেছে, তাহা বুঝিবার চেষ্টা করা যাইতে পারে।

মনোবিজ্ঞানের জটিল আলোচনা এই প্রবন্ধের বিষয় নহে। ক্যার্য্যের সংজ্ঞা-জ্ঞাপকতা সম্বন্ধে অনেক বৈদেশিক দৃষ্টান্ত সংগৃহীত আছে। এই প্রবন্ধের প্রধান উদ্দেশ্য—আমাদের দেশের কতিপয় সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তির গভীর মনের মহান্ ভাব কখন-কখনও তাঁহাদের

সাধারণ কার্য্যের মধ্যে ভঙ্গী দ্বারা প্রকাশ পাইবার চেষ্টা করিয়া, ঐ সকল কার্য্যের মধ্যে একটি সংজ্ঞা-জ্ঞাপকতা নির্দ্দেশ করিয়াছে, তাহারই কতিপয় দৃষ্টান্ত লিপিবদ্ধ করা। অবশ্য এই-সব দৃষ্টান্ত পাঠ করিয়া পাঠকেরা মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণ ব্যাপার সম্বন্ধে কতকটা অনুমান করিতে পারেন।

বৈদেশিক পণ্ডিতেরা কার্য্যের সংজ্ঞা-জ্ঞাপকতা কিরূপভাবে বুঝিয়াছেন, তাহা প্রকাশ করিবার জন্য, প্রথমতঃ একটি বৈদেশিক দৃষ্টান্ত, যতদূর স্মরণ আছে, লিপিবদ্ধ করা যাইতেছে।

(১) একজন বিখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ, আর একজন ভদ্র লোকের সঙ্গে বসিয়া খানা খাইতেছিলেন। ভদ্রলোকটি খাইতে-খাইতে তাঁহার নিজের অবস্থার কথা মনস্তত্ত্ববিদের নিকট গল্প করিতেছিলেন। ভদ্রলোকটি বলিতেছিলেন, "আমি একজন রাজদূতের অধীনে কেরাণীগিরি করিতাম। কিছুদিন পরে ঐ রাজদূত বদলী হইয়া চলিয়া যান। তাঁহার স্থলে আর একজন নূতন রাজদূত আসিলেন। এই নূতন লোকটি আসিবার পরই আমি গিয়া তাঁহার সঙ্গে দেখা করি নাই।"

ভদ্রলোকটি যখন শেষোক্ত কথা বলিতেছিলেন, তখন চামচে করিয়া খাবার মুখের নিকট খাইবার জন্য তুলিয়াছিলেন। কিন্তু অনবধানতা হেতু তাহা মাটিতে পড়িয়া গেল। সেই মনস্তত্ত্ববিদ্‌টি তাঁহার কার্য্যের এই ভঙ্গীটি দেখিয়া, তাহার মধ্যে যে সংজ্ঞা-জ্ঞাপকতা আছে, তাহা অনুমান করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি

এই ভদ্রলোকটিকে বলিলেন, "আপনি দেখা করিলেন না বলিয়া মুখের গ্রাস হারাইলেন।"

সেই ভদ্রলোকটি বলিলেন, "সেইরূপই ঘটিয়াছিল। আমি নূতন রাজদূতের সঙ্গে দেখা করিলাম না বলিয়া, ঐ রাজদূতটি নূতন একজন লোককে আমার কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। সম্ভবতঃ ঐ রাজদূতের সঙ্গে দেখা করিলে চাকরীটি আমারই হইত।"

মনস্তত্ত্ববিদ্, ঐ ভদ্রলোকের মুখ হইতে খাবারটি পড়িয়া যাইতে দেখিয়া, তাঁহার মনে ঐ কার্য্যের অনুরূপ কোন কিছু ভাবের উদয় হইয়াছে, তাহা অনুমান করিয়া প্রশ্ন করিয়াছিলেন। ভদ্রলোকটিও যেভাবে উত্তর দিয়াছিলেন, তাহাতে বুঝা যায় যে, মনস্তত্ত্ববিদের অনুমান ঠিকই হইয়াছিল।

(২) যখন ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়ের বাড়ীতে যাতায়াত করিতাম, তখন একটা বিষয় লক্ষ্য করিয়াছিলাম যে, তাঁহার বৈঠকখানা-ঘরে যে clock ঘড়িটি ছিল, সেটি বরাবরই fast চলিত।

একদিন ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়কে বলিলাম যে, ডাক্তার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তিনি আপনার বিষয়ে কি বলিলেন শুনুন।

ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন যে, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয় এরূপ অদ্ভুত লোক যে, তিনি নিজের ideasএর উপর কোনও দাবী রাখেন না। কোন একজন ছাত্র ডাক্তার শীলের সঙ্গে কোন

একটি দার্শনিক বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া,—ডাক্তার শীল ঐ বিষয়ে তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য এবং গবেষণা দ্বারা যে তত্ত্ব সংগ্রহ করিয়াছিলেন,—সবই শুনিয়া আসিল। ডাক্তার শীলের নিকট হইতে সংগৃহীত কথাগুলি লইয়া, সেই ছাত্রটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে Ph. D. উপাধি-লাভের জন্য একটি thesis লিখিয়া ফেলিল। thesisটি লেখা হইলে, তাহা সংশোধন করিয়া লইবার জন্য পুনরায় সে ডাঃ ব্রজেন্দ্র শীলের নিকট উপস্থিত হয়। ডাঃ শীল মহাশয় যত্নসহকারে তাহা সংশোধন করিয়া দিলেন। তখন সে thesisটি ছাপাইয়া ডাক্তার ব্রজেন্দ্র শীলের নিকট গিয়া জানাইল যে, আমার thesisটি Ph. D.র জন্য submit করিতে চাহি;—আপনার অভিমত জানাইয়া, আমাকে যদি একটি certificate-স্বরূপ কিছু লিখিয়া দেন, তাহা হইলে অনেক সুবিধা হইতে পারে। পরিশেষে ডাঃ ব্রজেন্দ্র শীলের certificateএর দরুণ ঐ ছাত্রটি Ph. D. হইয়া গেল। কিন্তু ঐ thesisএর সহিত ডাঃ ব্রজেন্দ্র শীলের যে কোনও সম্বন্ধ আছে, এ কথা প্রকাশ পাইল না।

ডাঃ রবী ঠাকুর মহাশয় বলিলেন,—"ডাঃ শীল বলেন যে, idea-গুলি সব universal। ইহার উপর কাহারও নিজের দাবী রাখা সঙ্গত হয় কি প্রকারে? কিন্তু আমি (রবীন্দ্র বাবু) ঠিক এ মত মানি না। সমুদ্রের জল universal বলা যাইতে পারে। কিন্তু তাই বলিয়া কি আমি তাহা হইতে এক কলসী জল নিজের

ব্যবহারের জন্য তুলিয়া রাখিব না ? মনে করুন, আমার একটি বড় বাড়ী আছে। তাহার ঘরগুলি অভ্যাগতগণকে ছাড়িয়া দিলেও কি ছোট একটি কুটীর নিজের ব্যবহারের জন্য রাখিতে পারিব না ? ইহার ফলে এই হইতেছে যে, ডাক্তার ব্রজেন্দ্র শীলের অগাধ পাণ্ডিত্যের ফলস্বরূপ, তাঁহার স্বলিখিত গভীর গবেষণামূলক কোন উপাদেয় পুস্তক জনসাধারণের জন্য প্রকাশিত হইতেছে না।"

আমি ডাক্তার ব্রজেন্দ্র শীল মহাশয়কে ডাঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের উপরিউক্ত কথাগুলি জানাইয়া বলিলাম যে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বোধ হয় ঠিক কথাই বলিয়াছেন। কোন ছাত্র আপনার ideaতে আপনার সাহায্য লইয়া যতই ভাল করিয়া লিখুক না কেন, আপনার নিজের লেখার মতন হওয়া সম্ভব নহে। আপনি নিজে পুস্তক লিখিয়া আপনার অগাধ পাণ্ডিত্যের ফল পৃথিবীকে দান করেন না কেন ?

ডাক্তার ব্রজেন্দ্র শীল মহাশয় ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "পুস্তক লিখতে হলে প্রথমতঃ timeএর সঙ্গে-সঙ্গে যেতে হয়; অর্থাৎ যে বিষয়ে পুস্তক লিখিবে, সে বিষয়ে যত গবেষণা হবে, তার সমস্ত খবর রেখে, সেইগুলি পড়ে অধিগত করতে হয়। তারপর time-এর সঙ্গে যাওয়ার চেয়ে যদি এগিয়ে যেতে পারা যায়, তাহলেই পৃথিবীর জন্যে কিছু বই লেখা সার্থক হয়। কিন্তু আমি এ পর্য্যন্ত time-এর সঙ্গেই পাল্লা দিয়ে উঠ্তে পারছি না। যদি এগিয়ে যেতে পারি, তখন ইচ্ছা আছে যে বই লিখব।"

ডাক্তার ব্রজেন্দ্র শীল মহাশয়ের এই কথা শুনিয়া, তাঁহার ঘড়ির সর্ব্বদা fast চলা তাঁহার মনের এই ভাবের সংজ্ঞা-জ্ঞাপকতার দরুণ হইতে পারে, ইহাই আমার বোধ হইল।

(৩) কবিবর রজনীকান্ত সেন যখন গলায় ক্যান্সার রোগগ্রস্ত হইয়া, মেডিক্যাল্ কলেজের কটেজ ওয়ার্ডে ভর্ত্তি হইয়াছিলেন। শারীরিক ব্যাধির দরুণ তিনি অসহনীয় যন্ত্রণা ভোগ করিতেছিলেন। কিন্তু হৃদয়ে ভগবদ্-প্রেম থাকিলে, এইরূপ অবস্থাতেও মানসিক শান্তি লাভ করা যায়—আধ্যাত্মিক শক্তির এই অপূর্ব্ব মহিমা তিনি শুধু গান করিয়া শুনান নাই, নিজের জীবনেও তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন। তখন তাঁহার ঐ ব্যাধির দরুণ কথা কহিবার শক্তি একেবারে লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। ডাঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ঐরূপ অবস্থায় একদিন কবিবরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। কবিবর রজনীকান্ত সেন এই সময় কাগজে লিখিয়া রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সঙ্গে কথাবার্ত্তা চালাইয়াছিলেন। তাহার বিবরণ নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় কবিবরের জীবন-বৃত্তান্তে প্রকাশ করিয়াছেন। কবিবর রজনীকান্ত অন্যান্য কথার মধ্যে নিম্নলিখিত কথাগুলি লিখিয়া রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সম্বর্দ্ধনা করেন—

"যদি দয়াল কণ্ঠ দিত, তবে আপনার 'রাজা ও রাণী' আপনার কাছে একবার অভিনয় করে দেখাতাম। আমি রাজার অভিনয় করেছি। এমন কাব্য, এমন নাটক কোথায় পাব! রাজার পার্ট আজও অনর্গল মুখস্থ আছে।

মনের কথা

"এ রাজ্যেতে যত সৈন্য, যত দুর্গ, যত কারাগার,
যত লোহার শৃঙ্খল আছে সব দিয়ে
পারে না কি বাঁধিয়া রাখিতে দৃঢ় বলে
ক্ষুদ্র এক নারীর হৃদয় !"

রাজা ও রাণী, ২য় অঙ্ক, পঞ্চম দৃশ্য।

কবিবর রজনীকান্ত সেনের এই কবিতা আবৃত্তি সম্বন্ধে সাধারণ লোকে অনেক রকম ধারণা করিতে পারেন। যেমন, কবিবর রজনীকান্তের থিয়েটারে এত সথ ছিল যে, তিনি মরণের দ্বারে আসিয়াও তাহার কথা, এমন কি, তাঁহার মুখস্থ পার্ট ভুলিতে পারেন নাই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়, যিনি মানব-চরিত্র-বিশ্লেষণের অদ্ভুত প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তিনি এই কবিতার আবৃত্তি সাধারণ লোকের মত সামান্যভাবে বুঝেন নাই। এই কবিতার আবৃত্তির মধ্যে যে কবিবর রজনীকান্তের গভীর ভাবের সংজ্ঞা-জ্ঞাপকতা আছে, ঠাকুর মহাশয় তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তিনি কবিবর রজনীকান্তকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে এই সংজ্ঞা-জ্ঞাপকতাটি ব্যাখ্যা করিয়া দিয়াছেন। ঐ পত্র হইতে এ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবরণটি উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল :—

"প্রীতিপূর্ণ নমস্কারপূর্ব্বক নিবেদন—

সেদিন আপনার রোগশয্যার পার্শ্বে বসিয়া মানবাত্মার একটি জ্যোতির্ম্ময় প্রকাশ দেখিয়া আসিয়াছি। শরীর তাহাকে আপনার

সমস্ত অস্থি, মাংস, স্নায়ু, পেশী দিয়া চারিদিকে বেষ্টন করিয়া ধরিয়াও, কোনমতে বন্দী করিতেছে না, ইহাই আমি প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইলাম। মনে আছে, সেদিন আপনি আমার রাজা ও রাণী নাটক হইতে প্রসঙ্গক্রমে নিম্নলিখিত অংশটি উদ্ধৃত করিয়াছিলেন—

'এ রাজ্যেতে যত সৈন্য, যত দুর্গ, যত কারাগার ;
যত লোহার শৃঙ্খল আছে, সব দিয়ে
পারে না কি বাঁধিয়া রাখিতে দৃঢ় বলে
ক্ষুদ্র এক নারীর হৃদয় ?'

এই কথা হইতে আমার মনে হইতেছিল, সুখ-দুঃখ-বেদনায় পরিপূর্ণ এই সংসারে প্রভূত শক্তির দ্বারাও কি ছোট এই মানুষটির আত্মাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারিতেছে না! শরীর হার মানিয়াছে ; কিন্তু চিত্তকে তারা পরাভূত করিতে পারে নাই। কণ্ঠ বিদীর্ণ হইয়াছে ; কিন্তু সঙ্গীতকে নিবৃত্ত করিতে পারে নাই।—পৃথিবীর সমস্ত আরাম ও আশা ধূলিসাৎ হইয়াছে ; কিন্তু ভূমার প্রতি ভক্তি ও বিশ্বাসকে ম্লান করিতে পারে নাই।—কাঠ যতই পুড়িতেছে, অগ্নি আরও তত বেশী করিয়াই জ্বলিতেছে। আত্মার এই মুক্ত স্বরূপ দেখিবার সুযোগ কি সহজে ঘটে ? মানুষের আত্মার সত্য প্রতিষ্ঠা যে কোথায়, তাহা যে অস্থি ও মাংস ও ক্ষুধা-তৃষ্ণার মধ্যে নাই, তাহা সেদিন সুস্পষ্ট উপলব্ধি করিয়া আমি ধন্য হইয়াছি।"

(৪) ছাত্রগণকে লইয়াই আচার্য্য পি, সি, রায়ের সংসার। এই সংসারের মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারিলে, আচার্য্য রায়ের সত্তার যথার্থ অনুভূতি হয় না। কোন অন্তরঙ্গ ছাত্রের প্রতি তাঁহার স্নেহানুভব হইলে, অনেক সময়ে তিনি তাহাকে দুই একটি ঘুষি না মারিয়া থাকিতে পারেন না। এই ঘুষির মধ্যে আশীর্ব্বাদ থাকে যে, "হে ছাত্র, তুমি বীর হও; আঘাত করিতে এবং আঘাত সহ্য করিতে শিখ। জড়তা পরিহার কর।" প্রায় পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে আমার সহিত আচার্য্য পি, সি, রায়ের জাতিভেদ সম্বন্ধে তর্ক উপস্থিত হয়। আচার্য্য রায় তাঁহার ঘুষির দ্বারাই এই তর্কের শেষ করেন। এই তর্কের বিবরণটি এখানে অবান্তর হইলেও, আচার্য্য পি, সি, রায়ের কথা লিপিবদ্ধ করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না,—পাঠকগণ ক্রটি মার্জ্জনা করিবেন।

আমি যখন খুলনায় সিবিল সার্জ্জন ছিলাম, তখন আচার্য্য পি, সি, রায় একবার খুলনায় বাগেরহাটে একজন ভদ্রলোকের বাড়ী যাইয়া উঠেন। এই সংবাদ পাইয়া আমি তথায় উপস্থিত হইলাম। আচার্য্য পি, সি, রায় আমাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি সরসী! কি মনে করে?"

আমি বলিলাম,—"আজ্ঞে আপনার সঙ্গে তর্ক করিতে। আপনি যখন কংগ্রেসের Social Conferenceএর সভাপতি হইয়াছিলেন, তখন জাতিভেদ প্রথাকে যেভাবে আক্রমণ করেন,

তাহা আমার মনে কিছু লাগিয়াছে। আমার বিশ্বাস, আপনার মত এত বড় বৈজ্ঞানিকের জাতিভেদ প্রথাকে ঐরূপ mob-oratorভাবে আক্রমণ করা উপযুক্ত হয় নাই। বৈজ্ঞানিকভাবে যদি ইহার আলোচনা করিতেন, সমালোচনা করিয়া দোষ দেখাইতেন, তাহা হইলে দুঃখ ছিল না। জাতিভেদ প্রথা ত এতদিন রহিয়াছে,—ইহার কি একটি biological basis নাই? তাহা না হইলে কি জাতিভেদ প্রথা এতদিন ধরিয়া টিকিয়া থাকিতে পারে? ডাক্তার ব্রজেন্দ্র শীল মহাশয় ত একজন ব্রাহ্ম। তাঁহার নিকট জাতিভেদের কথা তোলাতে, তিনি ত আপনার মত আক্রমণ করেন নাই! তিনি বরং ইহার সপক্ষে বৈজ্ঞানিক যুক্তি প্রদর্শন করিলেন।"

"আচ্ছা, সরসী, এখন বস। সে সব কথা পরে হবে। এখন কেমন আছ বল।" ইত্যাদি বলিয়া আচার্য্য রায় তখন উপস্থিত কথা চাপা দিলেন। ইহার কিছুক্ষণ পরে তিনি বৈকালিক ভ্রমণে বহির্গত হইলেন। তাঁহার ছাত্রদল তাঁহাকে ঘিরিয়া চলিল। আচার্য্য রায় আমার সঙ্গে কথা কহিবেন বলিয়া, ছাত্রদিগকে কিছু দূরে বেড়াইবার জন্য উপদেশ দিলেন।

আচার্য্য রায়। দেখ সরসী, আমি যেখানে উপস্থিত হইয়াছি, সেটি একটি বারুজীবী ভদ্রলোকের বাড়ী। এখানে জাতিভেদের কথা তুলিলে দেশ-কাল-পাত্র বিবেচনা করিয়া কার্য্য করা হইত না। বাগেরহাটে কলেজ-স্থাপন বিষয়ে এই

বারুজীবী ভদ্রলোকটিই বোধ হয় সকলের অপেক্ষা বিশেষ সাহায্য করিতেছেন। বারুজীবী শ্রেণীও তোমাদের ব্রাহ্মণ-কায়স্থ অপেক্ষা বোধ হয় বেশী সাহায্য করিতেছে। এই যে পাড়াটি দেখিতেছ, এইটি বারুজীবীদের পাড়া। ইহাদের ঘরগুলি কি পরিষ্কার দেখ। সকলেরই সুপারি, নারিকেল প্রভৃতির বাগান রহিয়াছে। এই-সবের দ্বারা ইহারা জীবিকানির্ব্বাহ করে,—চাকরীর কাঙ্গাল হইয়া বেড়ায় না। আবার ইহাদের শিক্ষার প্রতি অনুরাগ দেখ। অনেকেই বাগেরহাটে কলেজের কোন না কোন ছাত্রের থাকিবার স্থান, কিংবা খাদ্যাদির বন্দোবস্ত করিয়া, তাহাদের শিক্ষালাভের পথ সুগম করিয়া দিতেছে। তুমি কি ইহাদের ব্রাহ্মণ-কায়স্থদের চেয়ে ছোট বলিয়া মনে কর? যাক সে কথা। জাতিভেদ সম্বন্ধে তোমার বৈজ্ঞানিক যুক্তিটা শুনি?

আমি। ডাঃ ব্রজেন্দ্র শীল মহাশয়ের সঙ্গে জাতিভেদ সম্বন্ধে কথা হয়। তাহাতে তিনি কতকগুলি জীবতত্ত্বের পরীক্ষা সম্বন্ধে উল্লেখ করেন। যেমন, অতি নিকট-আত্মীয়দের মধ্যে বিবাহের ফলে বংশ-বৃদ্ধি হইলে, Science of Embryologyর কতক-গুলি experimentsএর দ্বারা বুঝা যায় যে, ইহাতে embryoর এক অংশের (chromosome) বিকাশ (development) ভালরূপ হয় না। অপর পক্ষে, যদি বিবাহের বর-কন্যা নির্ব্বাচনের কোনরূপ গণ্ডী না থাকে, তাহা হইলে সে জাতি কোন বিষয়ে বিশেষত্ব লাভ করিয়া, শীঘ্রই উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে

পারে না। যদি জীব-বিজ্ঞানের উপরিউক্ত দুইটি নিয়ম সত্য বলিয়া মানিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে জাতিভেদে উদ্বাহ-প্রথা সম্বন্ধে একটি গণ্ডী স্বতঃই আসিয়া পড়ে।

হিন্দু জাতির মধ্যে প্রচলিত জাতিভেদ প্রথার, এই জাতির evolutionকে সাহায্য করিবার পক্ষে কতকটা শক্তি ছিল এবং এখনও আছে, এই কথাটি মোটেই ধরা হয় না যেন? অবশ্য বর্ত্তমান জাতিভেদ প্রথার মধ্যে অনেক জিনিস রহিয়াছে, যাহা জাতির মধ্যে জড়ত্ব আনিয়া দিতেছে। কিন্তু একটি biological analogy হইতে আমার বোধ হয় যে, এইটি সম্ভবতঃ জাতি-ভেদ প্রথার দরুণ হইতেছে না,—environmentএর দরুণ হইতেছে। এই দেখুন, শামুক, গুগলী প্রভৃতি জীব নিজদের খোলার কঠিন আবরণে এবং ঐ আবরণের ভারে অনেকটা জড়ত্ব লাভ করিয়াছে। এই শামুক, গুগলী প্রভৃতি জীব মৎস্য শ্রেণীর জীবের পূর্ব্বে সৃষ্ট হইয়াছিল। জীবতত্ত্ববিদ্‌গণ অনুমান করেন, প্রথমে যখন শামুক, গুগলী প্রভৃতি জীবের আবির্ভাব হয়, তখন তাহাদের এই কঠিন বহিরাবরণের বোঝা ছিল না। সম্ভবতঃ, তখন তাহারা এই বহিরাবরণের বোঝা হইতে মুক্ত থাকিবার দরুণ, তাহাদের অপেক্ষাকৃত স্বাধীনভাবে চলা-ফেরা করিবার সামর্থ্য ছিল! তাহার পর যখন পৃথিবীতে মৎস্য শ্রেণীর জীবের আবির্ভাব হইল, তখন এই পুরাতন জাতির, আপনাদের পৈতৃক প্রাণ বাঁচাইবার জন্য, বহিরাবরণের বোঝা সৃষ্টি করিতে হইয়াছিল।

তাহা না হইলে মৎস্য শ্রেণীর জীবগণের কৃপায় এই শ্রেণীর জীবগণকে পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হইতে হইত। জাতিভেদের মধ্যে যে জড়তা আসিয়া পড়িয়াছে, তাহা অনেকটা এইরূপ বলিয়া বোধ হয়। মুসলমানের আমলে এই জাতির স্বাধীনতা লোপ পাইলে, জাতিভেদ প্রথাকে বিশেষরূপে কঠিন করিয়া, জাতির বিশিষ্টতা রক্ষা করিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল। কিন্তু ইহাও লক্ষ্যের বিষয় যে, বর্ত্তমান ভারতবর্ষের মধ্যে তিনজন জগদ্বিখ্যাত মনীষি—সার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সার জগদীশচন্দ্র বসু এবং আপনি —তিনজনই ব্রাহ্মণ এবং কায়স্থ বংশ হইতে উদ্ভূত। University পরীক্ষার result দেখুন। যাহারা পরীক্ষায় উচ্চ স্থান অধিকার করে, তাহাদের মধ্যে উচ্চ জাতির বংশধরের সংখ্যা অধিক কি না? এই সকল ঘটনার মধ্যে কি জাতিভেদের কোনই প্রভাব নাই? নিম্ন জাতির ছেলেদের পাশের percentage কি উচ্চ জাতির ছেলেদের পাশের percentage অপেক্ষা কম নহে?

আচার্য্য রায়। তথাকথিত নিম্ন শ্রেণীর ছেলে এবং তোমাদের উচ্চ শ্রেণীর ছেলের মধ্যে কোনও intrinsic difference আছে, এ কথা আমি বিশ্বাস করি না। অতি নিম্ন শ্রেণীস্থ গরীব নিরক্ষরের বাড়ীতে এমন ছেলে আছে, তাহাকে যদি ভদ্র পোষাক পরাইয়া সভায় আনা যায়, তাহা হইলে তুমি চেহারায়, বুদ্ধিতে, গুণে তাহার সহিত ব্রাহ্মণ-কায়স্থ ছেলেদের কোনই প্রভেদ ধরিতে পারিবে না। তোমাদের উচ্চ শ্রেণীগণের মধ্যে

লেখাপড়ার চর্চ্চা অনেক দিন হইতে প্রচলিত আছে বলিয়া, তাহারা ভাল করিয়া পাশ করে,—তাহাদের মধ্যে অধিক সংখ্যক পাশ করে। তথাকথিত নিম্ন শ্রেণীগণের মধ্যে লেখাপড়ার চর্চ্চা প্রচলিত হইলে, তাহাদের মধ্যেও এরূপ হইবে।

আমি। সার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট ঐ কথা বলাতে, তিনি ঠিক এই উত্তরই দিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া, তিনি আর একটি যুক্তি দিয়াছিলেন—সেটিও ভাবিবার বিষয়। তিনি বলেন, বেদের সময়ে যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি বিভিন্ন জাতি ছিল, তাহা বৌদ্ধযুগে সংমিশ্রিত হইয়া সব খিচুড়ি পাকাইয়া গিয়াছিল। তাহার পর আবার নূতন করিয়া ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, কায়স্থ প্রভৃতি জাতি-বিভাগ হইয়াছে। বেদের সময় হইতে যদি ব্রাহ্মণ প্রভৃতি বিভিন্ন জাতি অন্য জাতির সহিত অসংমিশ্রিত থাকিয়া, তাহাদের জাতিগত পার্থক্য একাল পর্য্যন্ত বজায় রাখিত, তাহা হইলে বিভিন্ন জাতির biological characteristics প্রভৃতির উপর তর্ক চলিতে পারিত। কিন্তু সংমিশ্রণের পর আর এরূপ তর্ক চলে না। অবশ্য এসব বিষয়ে different sides আছে; তাহা নির্দ্ধারণ করা নিতান্ত সহজ নহে—এ কথা আমি মানি।

আচার্য্য রায়। যাহা হউক, এই তর্কের সার কথাটি তোমাকে আমি জিজ্ঞাসা করি। তোমার বংশ বেশ intellectual বংশ। ডাঃ ব্রজেন্দ্র শীলের বংশও তাই। তোমার বংশের পুত্র-কন্যার

কাহারও সঙ্গে যদি ডাঃ ব্রজেন্দ্র শীলের বংশের কোন পুত্র-কন্যার বিবাহ হয়, তাহা হইলে ভবিষ্যৎ বংশধরের কোন অংশে গুণহীন হইবার সম্ভাবনা আছে কি? কিংবা ধর, যদি বাঙ্গালী এবং পাঞ্জাবীদের মধ্যে বিবাহ প্রথা চলিত হয়, তাহা হইলে কি ভাবী বংশধরেরা degenerated হইবে?

আমি। এ কথার জবাব দেওয়া সহজ নহে। এক পক্ষে দেখুন, হার্বার্ট স্পেন্‌সারের মতে ভারতবর্ষীয় এবং European জাতির সংমিশ্রণে যে Eurasian জাতির উৎপত্তি হইয়াছে, তাহারা এই উভয় জাতি অপেক্ষা degenerate product। অপর পক্ষে Hugenots অর্থাৎ যে ফরাসীরা Catholic ধর্ম্ম না মানিবার জন্য Englandএ বিতাড়িত হইয়াছিল, সেই ফরাসী এবং ইংরেজের সংমিশ্রণে যে বংশ উৎপন্ন হয়, তাহারা অপেক্ষাকৃত উন্নত হইয়াছিল। পূজনীয় বাবু মতিলাল ঘোষ কৌলিন্য প্রথা সম্বন্ধে একটি কথা বলিয়াছিলেন,—সে কথাটি আমার মনে লাগে। তিনি বলিয়াছিলেন যে, কৌলিন্য প্রথার উপকারিতা এই যে, ইহার দ্বারা বাহিরের fresh blood আসিয়াছে। কৌলিন্য প্রথার নিয়ম এই যে, কতক সংখ্যা পর্য্যায়ের পর কৌলিন্য প্রথা আপনা-আপনি ভাঙ্গিয়া যাইবে; তখন আবার বাহির হইতে নূতন বিশিষ্ট লোক লইয়া কৌলিন্য প্রথা আরম্ভ করিতে হইবে। মধ্যে মধ্যে জাতি কিংবা শ্রেণীতে এইরূপ বাহির হইতে fresh blood না আনিলে, জাতি কিংবা শ্রেণী degenerate করে। এই

কথাটি জীব-বিজ্ঞান মতে সম্পূর্ণ সত্য (যেমন rejuvination amongst protozoa)। ডাঃ ব্রজেন্দ্র শীল আমাকে বলিয়াছিলেন যে, হিন্দুজাতি race instinctএর সহায়তায় জাতিভেদ প্রথা এদেশে প্রচলিত করে ; তাহার মধ্যে অনেকটা সারবত্তা ছিল। কিন্তু এক্ষণে ঐ প্রথা আমাদের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও গবেষণা দ্বারা নির্দ্ধারিত প্রণালী অনুযায়ী পরিবর্ত্তিত হওয়া উচিত।

আচার্য্য রায়। তোমার দেশ ভক্তি আছে, এ কথা জানি। দেশ-ভক্তির দিক দিয়াই এই বিষয়টির বিচার করা যাউক। বাঙ্গালা দেশে যখন মুসলমানদের আক্রমণ হয়, তখন অতি অল্পসংখ্যক মুসলমানই প্রথমে এ দেশে আসিয়াছিল। কিন্তু দেখ, মুসলমানদের এই দেশে আসিবার পর, হিন্দুদের মধ্যে অনেক জাত দলে দলে মুসলমান হইতে সুরু করিল। পশ্চিমে যেখানে মুসলমান আক্রমণের প্রভাব এই বাঙ্গলা দেশ হইতে অনেক বেশী ছিল, সেখানকার হিন্দুরা এই বাঙ্গালা দেশের মত দলে দলে মুসলমান হয় নাই। বাঙ্গলায় বেশী মুসলমান হইবার কারণ যে শুধু মুসলমানদের অত্যাচার, কিংবা তাহাদের প্রভুত্ব, এরূপ কথা বলা যায় না। ইহার কারণ এই যে, জাতিভেদ প্রথার দরুণ অনেকের অবস্থা এইরূপ হইয়াছিল যে, তাহারা এই জাত ছাড়িতে পারিলে বাঁচে। যেমন মুসলমানেরা আসিয়া পড়িল, অমনি অনেক ছোট জাত বড় জাতদের হাত হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য মুসলমানদের আশ্রয়

গ্রহণ করিল। যে জাতিভেদ এই দেশের মধ্যে এইরূপ একটি disruptive force সৃষ্টি করিতেছে, তাহাকে কি তুমি ভাল বলিতে পার? নীচের খিলান ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে,—তাহার উপরে কি কোনও বৈজ্ঞানিক কারিকুরি করিবার অবসর আছে? দেশের বড় বড় patriotদের কথা একবার শোন। রবী ঠাকুরের প্রধান কথা—জাতিভেদেই এই জাতিটাকে উৎসন্ন দিতেছে। ডি, এল, রায় দেশ রক্ষা করিবার জন্য হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিবাহ প্রথা প্রচলিত করিতে প্রস্তুত। যদি কাহারও পুরুষোচিত patriotism থাকে, তাহা হইলে সে কবি হেমচন্দ্র। তিনি গাহিয়াছেন, "একবার তোরা জাতিভেদ ভুলে মা বলিয়া ডাকে।"

আচার্য্য রায় অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া, স্নেহমিশ্রিত বিদ্রূপের স্বরে বলিলেন,—

"সরসী, তোমরা কায়স্থ; কিন্তু বোধ হয় তোমরা আমাদের মত শ্রেষ্ঠ কায়স্থ নও, ছোট কায়স্থ; সেইজন্যই বোধ হয় তোমার জাতের উপর এতটা মায়া!"

তাহার পর পিতা যেমন তাঁহার ছোট পুত্রকে আদর করেন, সেইরূপ কিছু আধআধ স্বরে বলিলেন, "সরসী, তুমি যখন কলেজে পড়িতে, তখন বড় রোগা ছিলে। এখন ত বেশ মোটা হইয়াছ,—দেখি, গায়ে কেমন জোর হইয়াছে।" আমি অমনি বুক ফুলাইয়া আচার্য্য রায়ের সম্মুখে দাঁড়াইলাম। তিনি

তাঁহার শীর্ণ হাড়-বের-করা হাতের ঘুষির জোর দিয়া আমার গায়ের জোর পরীক্ষা করিলেন। এই ঘুষির মধ্যেও যে, জাতিভেদ সম্বন্ধে উপদেশ ছিল, তাহা আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম।

শ্রীমদ্ ভগবদ্‌গীতায় লিখিত আছে যে, যখন অর্জ্জুন যুদ্ধ করা না-করা সম্বন্ধে শ্রীভগবানের সঙ্গে তর্ক করেন, তখন শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে বলেন, হে অর্জ্জুন, তুমি বেশ লম্বাচওড়া কথা বলিয়া তর্ক আরম্ভ করিয়াছ বটে, কিন্তু তোমার তর্কের কথাগুলি যদি নিজের মনের মধ্যে তলাইয়া দেখ, তাহা হইলে দেখিবে, তাহা তোমার নিজের ক্ষুদ্র হৃদয়-দৌর্ব্বল্য এবং ক্লৈব্য ছাড়া আর কিছুই নহে। *

যেসব ছাত্র আচার্য্য রায়কে অন্তরঙ্গভাবে জানে, তাহারা আচার্য্য রায়ের এই ঘুষির মর্ম্ম বুঝিতে পারে।

ঘুষিটা কিছু জোরে হইয়া গিয়াছিল। সেইজন্য আচার্য্য রায় বলিলেন,—"আহা সরসী, তোমার লাগে নাই ত। কিন্তু কি করিব। যখন এই জাতিভেদের কথা ভাবি, তখন পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত রাগে জ্বলে উঠে যে, ব্রাহ্মণেরা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে এই জাতির উন্নতির পথ কি করে বন্ধ করে গিয়েছে।"

---

* ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ॥

* * * * *

অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে।
গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ॥

গীতা, ২য় অধ্যায়।

স্বপ্নতত্ত্ব

ডাঃ শ্রীগিরীন্দ্রশেখর বসু স্বপ্নতত্ত্ব সম্বন্ধে মনোবিজ্ঞানের আধুনিক আবিষ্কার বঙ্গ-ভাষায় প্রকাশ করিয়া বঙ্গ-সাহিত্যের বিশেষভাবে পরিপুষ্টি সাধন করিতেছেন। ডাঃ ফ্রয়েড স্বপ্ন সম্বন্ধে গবেষণা করিবার একটি নূতন পথ আবিষ্কার করিয়া মনোরাজ্যের একটি নূতন দেশে প্রবেশ করিবার উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছেন। ডাঃ ফ্রয়েড স্বপ্নতত্ত্ব সম্বন্ধে অনেকগুলি প্রধান সত্য আবিষ্কার করিয়া এই রাজ্যে প্রবেশের পথগুলি অনেকটা সুগম করিয়া দিয়াছেন। অনেক পাশ্চাত্য মনীষি এই সব উপায়ে মনোরাজ্যের এই প্রদেশে প্রবেশ করিয়া সূক্ষ্মভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া সত্য নির্দ্ধারণ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। ভারতবর্ষ দর্শন শাস্ত্র এবং মনোবিজ্ঞানের আলোচনার জন্য পৌরাণিক যুগ হইতে প্রসিদ্ধ। স্বপ্ন সম্বন্ধে আলোচনা করিবার এই সব নূতন উপায়ের বিবরণ পাঠ করিয়া যাঁহাদের মনে কৌতূহল উৎপন্ন হয়, তাঁহারা যদি নিজেদের স্বপ্ন বিশ্লেষণ করিয়া লিপিবদ্ধ করেন, তাহা হইলে হয় ত মনোবিজ্ঞানের উপকার হইতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ডাঃ গিরীন্দ্রশেখর বসুর *Concept of Repression* নামক পুস্তকের উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই পুস্তকে ডাঃ বসু নিজের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিয়া মৌলিক গবেষণা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

স্বপ্ন আলোচনা সম্বন্ধে মুস্কিল এই যে, স্বপ্ন আলোচনা করিতে গেলে এমন গোপনীয় কথা আসিয়া পড়ে, যাহাতে স্বপ্ন সাধারণের মধ্যে প্রকাশ করা যায় না। আবার সকল স্বপ্নে ব্যক্তিগত খুঁটিনাটি এরূপভাবে জড়িত থাকে যে, তাহা বুঝাইবার জন্য নিজের সাতকাণ্ড ইতিহাস বর্ণনা করিতে হয়। আবার ইতিহাসগুলির বিশেষত্ব এই যে, এইগুলি অপরের নিকট তুচ্ছ ও অপ্রয়োজনীয়, নিজের নিকট তাহাদের স্মৃতিগুলিও বিশেষ সন্তোষকর নহে।

নিজের স্বপ্ন বিশ্লেষণের চেষ্টা করিবার আগে ডাঃ ফ্রয়েড কিরূপভাবে তাঁহার নিজের স্বপ্ন বিশ্লেষণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহার একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া ভাল। কারণ, একাধিক দৃষ্টান্ত না পাঠ করিলে, স্বপ্ন-বিশ্লেষণের ব্যাপার ভাল করিয়া বুঝা যায় না।

নিম্নলিখিত স্বপ্নটি ডাঃ ফ্রয়েডের স্বপ্ন সম্বন্ধে একখানি পুস্তক হইতে কিছু সংক্ষেপ করিয়া উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইতেছে। তিনি যেদিন এই স্বপ্ন-বিবরণটি লিপিবদ্ধ করেন, তাহার ঠিক পূর্ব্ব-রাত্রে এই স্বপ্নটি দেখিয়াছিলেন। দৃষ্ট স্বপ্নটি তখন-তখনই লিখিয়া না ফেলিলে, তাহা প্রায়ই ভুলিয়া যাইতে হয়; কিংবা স্বপ্ন-বিবরণটি মনের মধ্যে আপনা আপনিই পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়।

স্বপ্নটি এইরূপ—কোনও এক হোটেলের টেবিলে বসিয়া ডাঃ ফ্রয়েড্ অপর কয়েকজন ব্যক্তির সহিত একত্র আহার

করিতেছেন। স্পাইনাক (spinach) নামক এক প্রকার তরকারী সকলকে খাইবার জন্য পরিবেশন করা হইল। মিসেস্ ই, এল, তাঁহার ঠিক পার্শ্বে বসিয়া তাঁহার উপরই সমস্ত মনোযোগ দিতেছিলেন। তিনি বিশেষ পরিচিতভাবে নিজ হস্ত ডাক্তার ফ্রয়েডের হাঁটুর উপর রাখিলেন। ডাক্তার ব্যবধান রক্ষার জন্য তাঁহার হাতটি সরাইয়া লইলেন। তাহার পর মিসেস্ ই, এল্, তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"তোমার চক্ষু দুইটি সব সময়েই সুন্দর।" তৎপরে ডাক্তার পরিষ্কারভাবে দুইটি চক্ষুর মত দেখিলেন। চিত্রিত চক্ষুর ন্যায় —অথবা চশমার ন্যায় দুইটি চক্ষু তাঁহার নয়নগোচর হইল।

ফ্রয়েড্ বলিয়াছেন "সমস্ত স্বপ্ন বৃত্তান্তটি এই,—অন্ততঃ এই-টুকু আমার স্মরণ রহিয়াছে। এই স্বপ্নটি কেবল যে তমসাচ্ছন্ন এবং অর্থশূন্য বলিয়া বোধ হইল, তাহা নহে,—বিশেষভাবে অসংলগ্ন বলিয়াও বিবেচনা হইল।" মিসেস্ ই, এল্-এর সঙ্গে তাঁহার দেখাশুনা করিবার মত আলাপ পরিচয় ছিল কি না, তাহা তাঁহারই মনে হয় না। কখনও যে তিনি এই মহিলার সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে আলাপ করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তাহাও মনে পড়ে না। তিনি মিসেস্‌কে বহুদিন পর্য্যন্ত দেখেনই নাই। কখনও যে কেহ তাঁহার সম্মুখে এই মহিলার নাম পর্য্যন্ত উল্লেখ করিয়াছিল, এখনও তাঁহার স্মৃতিপথে নাই। এই স্বপ্ন দেখিবার সময় তাঁহার মনে কোনই ভাবের উদয় হয় নাই।

ফ্রয়েড্ অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া এই স্বপ্নের অর্থ স্থির করিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তাহাতে এই স্বপ্ন একটুও পরিষ্কার হইল না। তাহার পর তিনি স্বপ্ন-বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। স্বপ্নের এক একটি বিভিন্ন অংশ পৃথক করিয়া লইয়া তাহার উপর মন স্থির করিলে, কি কি চিন্তা মনে স্বতঃই উদিত হয়, তাহা পূর্ব্ব হইতে কিছু না ভাবিয়া, এবং যে যে চিন্তা উদয় হইতেছে তাহার কোনও সমালোচনা না করিয়া, একখানি কাগজে তৎক্ষণাৎ লিখিয়া লইতে লাগিলেন। আমরা ফ্রয়েডের এই বিশ্লেষণ সংক্ষেপে তাঁহার ভাষায় নিম্নে উল্লেখ করিলাম।

১। অপর কয়েকজন ব্যক্তির সহিত মিলিত হইয়া হোটেলে যাওয়া :—ইহাতে পূর্ব্বদিনের বৈকালের একটি সামান্য ঘটনার কথা মনে পড়ে। গতকল্য একটি ছোট দলের সহিত খাওয়া শেষ করিয়া একজন বন্ধুর সঙ্গে বাহিরে আসিয়াছিলাম। তখন সেই বন্ধুটি আমাকে বাড়ী পৌঁছাইয়া দিতে চাহিলেন। তিনি বলিলেন—'আমি ভাড়াটিয়া মোটর-গাড়ীতে ভ্রমণ করিতে ভালবাসি ; কারণ, তাহাতে বেশ সময় কাটে। ইহাতে দেখিবার কিছু আছেই।' আমরা গাড়ীতে বসিলেই শকট-চালক, তাহার সেই চক্র—যাহা দ্বারা ভাড়ার পরিমাণ নির্দ্ধারণ করা হয়—তাহা ঘুরাইয়া ৬০ হেলার অঙ্কে লইয়া গেল। আমি তাহাকে ব্যঙ্গ করিয়া বলিলাম—'বসিয়াছি কি—অম্‌নি আমাদের ৬০ হেলার ধার হইল।' এই মোটর গাড়ী আমাকে হোটেলের

টেবিলের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। ইহা আমাকে আমার ধারের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া স্বার্থপর ও লোভী করে। আর এই প্রাপ্যটি এত শীঘ্র শীঘ্র বৃদ্ধি হয় যে, মনে ভয় হয়, আমি অসুবিধায় পড়িলাম। যেমন আমি—হোটেলের টেবিলে বসিয়া যখন খাই, তখন মনে মনে কৌতুকজনক আশঙ্কা উপস্থিত হয় যে, আমি বুঝি কম পাইতেছি,—আমার নিজের সংক্রান্ত বিষয়ের প্রতি নিজেরই দৃষ্টি রাখিতে হইবে। এই সকল চিন্তার সহিত দূর সম্পর্কে গেটের দুই লাইন কবিতা মনে পড়িয়া গেল—

"এই পৃথিবীতে, এই ক্লান্তিময় পৃথিবীতে তুমি আমাদিগকে লইয়া আসিয়াছ। পাপের রাস্তায় তুমি আমাদিগকে মনোযোগ-শূন্য হইয়া চলিতে ছাড়িয়া দিতেছ।"

এই হোটেলের টেবিলের কথায় আর এক কথা মনে পড়িল। টাইলোরিজ নামক স্বাস্থ্যকর স্থানে যখন বেড়াইতে গিয়াছিলাম, তখন মধ্যাহ্নে সেখানকার হোটেলের টেবিলে যখন ভোজন করিতেছিলাম, তখন আমার স্ত্রীর প্রতি বড়ই অসন্তুষ্ট হইয়াছিলাম; কারণ, তিনি সেখানে আমাদের প্রতিবেশী কোনও কোনও ভদ্রলোকের সহিত বড়ই সঙ্কোচশূন্য হইয়া ব্যবহার করিতেছিলেন। তিনি তাহাদের সঙ্গে কোনওরূপ আলাপ পরিচয় না করেন, এইটিই আমার ইচ্ছা ছিল। আমি তাঁহার নিকট এই প্রার্থনা করিয়াছিলাম যে, তিনি অপরিচিত

লোকের জন্য নিজেকে ব্যস্ত না করিয়া, আমার জন্য যেন ব্যস্ত হন। এইজন্যই বোধ হয় আমি হোটেলের টেবিলে অসুবিধায় পড়িয়াছিলাম। এই টেবিলে স্ত্রীর ব্যবহার এবং স্বপ্নে মিসেস্ ই, এল্-এর ব্যবহারের প্রভেদ অনুভব করিতেছি। তাঁহার সমস্ত অভিনিবেশ আমার উপর।

এক্ষণে আমি বুঝিতে পারিলাম যে, স্বপ্নে আমাদের বিবাহের পূর্ব্বের একটি প্রণয়ের ঘটনার ছবি রহিয়াছে। বিবাহের পূর্ব্বে আমার ভবিষ্যৎ পত্নীকে একটি প্রেম-লিপি লিখিয়াছিলাম। ইহার যেন জবাব-স্বরূপ তিনি আদর করিয়া টেবিলে বসিয়া খাইবার সময় আমার হাঁটুর উপর হাত দিয়াছিলেন। স্বপ্নে আমার স্ত্রীর স্থানে মিসেস্ ই, এল্ হইয়া গিয়াছে।

যাঁহার নিকট আমি বিশেষ ঋণগ্রস্ত হইয়া রহিয়াছি—মিসেস্ ই, এল তাঁহারই কন্যা। আমি যাহা কখনও আশা করি নাই —স্বপ্নের দৃশ্যের সঙ্গে আমার চিন্তার এমন কোনও যোগ দেখিলাম। স্বপ্নের এক অংশ হইতে আরম্ভ করিয়া কেহ যদি যথাযথরূপে তৎসংযুক্ত ভাবগুলির সংযোগসূত্র অবলম্বন করিয়া সেই স্বপ্নের পরবর্ত্তী অংশ-সকলের উপর মনোযোগ করে, এবং স্বকীয় পূর্ব্বানুভূতির সহিত মিলাইয়া লইবার চেষ্টা করে, তাহা হইলে স্বপ্নের প্রকৃত মর্ম্মার্থ বুঝিবার আশা করা যায়। অনেক স্বপ্ন প্রথমে প্রহেলিকার মতই বোধ হয়; কিন্তু উহার প্রত্যেক অংশের সহিত অপরাংশের সংযোগসূত্র ধরিয়া আমাদিগের

পূর্ব্বানুভূত ঘটনা-সকলের সহিত মিলাইয়া লইতে পারিলে, স্বপ্নের অর্থ বোধ করা যাইতে পারে।

যখন কেহ আশা করে যে, অপর একজন লোক নিজের সুবিধা না দেখিয়া তাহারই সুবিধা দেখিবে, তখন কি ঠাট্টাচ্ছলে এই নির্দ্দোষ প্রশ্ন করা যায় না যে—"তুমি কি আশা কর, তোমার সুন্দর চক্ষুর জন্য এই কাজ করা হইবে?" ইহা হইতে স্বপ্নে মিসেস্ ই, এল-এর কথা হইয়াছে—"তোমার চক্ষু দুইটি সব সময় এত সুন্দর।"—ইহার অর্থ আর কিছুই নহে যে—"সমস্ত লোক ভালবাসিয়াই তোমার সমস্ত কার্য্য করিয়া দেয়।"—অবশ্য ইহার বিপরীতটাই সত্য; লোকের কাছে যখনই কোন সদয় ব্যবহার পাইয়াছি, সব সময়েই তাহার মূল্য আমি যথেষ্ট পরিমাণে দিয়াছি। তথাপি, আমি যে কাল বিনামূল্যে গাড়ীতে চড়িতে পাইয়াছিলাম, যখন আমার বন্ধু একটি মোটর গাড়ী করিয়া আমাকে বাড়ী পৌঁছাইয়া দিয়াছিল, সেটি আমার মনে কিছু চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছিল।—

ঐ বন্ধু (গত কল্য যিনি আমাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইয়াছিলেন) অনেকবার আমাকে তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি একবারমাত্র আমার নিকট হইতে উপঢৌকন পাইয়াছেন। সেটি একটি পুরাতনকালের শাল। এই শালের চতুর্দ্দিকে চক্ষু অঙ্কন করা আছে। লোকের বিশ্বাস যে, এইরূপ শাল গায়ে থাকিলে লোকের মন্দ দৃষ্টি লাগে

না। তাহা ছাড়া আমার বন্ধুটি চক্ষু-বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী। সেইদিন বৈকালেই তাঁহার নিকট একটি রোগীকে তাহার চশমা ঠিক করিয়া লইবার জন্য পাঠাইয়াছিলাম। স্বপ্নের অধিকাংশের মধ্যে একটি নূতন সম্বন্ধ আবিষ্কার হইবার পর মনে করিলাম, স্পাইনাক তরকারি স্বপ্নে বাঁটিয়া দেওয়া—দেখার অর্থ কি? ইহার কারণ, আমাদের খাইবার টেবিলেই স্পাইনাক সম্বন্ধে একটি সামান্য ঘটনা ঘটিয়াছিল। একটি ছেলে যাহার চক্ষু যথার্থই সুন্দর, সে স্পাইনাক খাইতে রাজী হইল না। ছেলেবেলায় আমিও ঠিক ঐরূপই ছিলাম। ছেলেবেলায় আমি স্পাইনাক খাইতে ঘৃণা বোধ করিতাম। বয়স কিছু অধিক হইলে মুখের স্বাদ বদলাইয়া গেল। স্পাইনাক তখন আমার নিকট সুস্বাদু হইল। এই স্পাইনাকের কথায় আমার ছেলের বাল্যজীবন আর আমার বাল্যজীবন যেন খুব কাছাকাছি আসিল। ঐ ক্ষুদ্র শিশু খাদ্যের স্বাদ বিলক্ষণ বুঝিত। একদিন তাহার মাতা তাহাকে বলিয়াছিল—"স্পাইনাক পাইলে বলিয়া সুখী হও। অনেক শিশু স্পাইনাক পাইলে ভাগ্য বলিয়া মনে করে।" ইহাতে শিশুদিগের প্রতি পিতামাতার কর্ত্তব্যের কথা মনে পড়িল। এইভাবে গেটের সেই কথা—'এই পৃথিবীতে—ক্লান্তিময় পৃথিবীতে তুমি আমাদিগকে লইয়া আসিয়াছ। পাপের রাস্তায় তুমি আমাদিগকে মনোযোগশূন্য হইয়া চলিতে ছাড়িয়া দিতেছ।' এই কথা যেন নূতন অর্থে অনুভব করিলাম।

এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে স্বপ্নের এক একটি বিভিন্ন অংশ পৃথক করিয়া, তাহা হইতে ভাবসংহতি (Association) ধরিয়া লইয়া আমার মনে যে-সকল চিন্তা ও পূর্ব্বস্মৃতি উদয় হইয়াছিল, সেগুলি আমার মনের কৌতূহলকর বিশ্বাস—এ কথা অবশ্য আমায় স্বীকার করিতে হইবে। বিশ্লেষণ করিয়া যাহা পাওয়া গিয়াছে, তাহা দৃষ্ট স্বপ্নের সহিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট থাকিলেও, এই সম্বন্ধটি এত বিশেষ যে, এইসব নূতন আবিষ্কার আমি দৃষ্টস্বপ্ন হইতে অনুমান করিতে পারিতাম না। স্বপ্নে ভাবের আবেগ ছিল না ; এবং ইহা খাপছাড়া এবং অর্থশূন্য ছিল। কিন্তু এই স্বপ্নের পশ্চাতে পূর্ব্বের অনুভূত যে সকল ভাব আছে, তাহা যখন আমি উদ্ধার করিতেছিলাম, তখন তীব্র-ভাবের আবেগ অনুভব করিতে লাগিলাম ; এবং সেই ভাবের আবেগ অনুভব করিবার যথার্থই হেতু ছিল। এই চিন্তাগুলি কতিপয় কেন্দ্রীভূত ভাবের চতুর্দ্দিকে যেন সুন্দররূপে সজ্জিত হইয়া রহিয়াছে। এই কেন্দ্রীভূত ভাবগুলি স্বপ্নের দৃশ্যের মধ্যে প্রদর্শিত হয় না ; কিন্তু ইহারা পরস্পর বিরুদ্ধ ভাব ; যেমন স্বার্থপরতা—নিঃস্বার্থপরতা—ঋণগ্রস্ত হওয়া—বিনামূল্যে কার্য্য করা। আমি আমার বিশ্লেষণের দ্বারা যে বিভিন্ন সূত্রের একটি জাল পাইয়াছি, আমি দেখাইতে পারি যে, সকল সূত্রই একটি গাঁইটের মধ্য দিয়া যাইতেছে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক কারণের জন্য নহে, নিজের ব্যক্তিগত গোপন কারণের জন্য আমি সাধারণ্যে

তাহা প্রকাশ করিতে পারিতেছি না। নিজের অনেক কথা বিশেষ ইচ্ছা না থাকিলেও প্রকাশ করিতে হইয়াছে ; কিন্তু ইহা ছাড়াও অনেক কথা আছে, যাহা আমি গোপন রাখাই বাঞ্ছনীয় মনে করি।—যদি বল, সাধারণের নিকট প্রকাশ করিবার যোগ্য স্বপ্ন বিশ্লেষণ করিবার জন্য গ্রহণ করিলে না কেন ? তাহার উত্তরে আমি এই কথা বলি যে, প্রত্যেক স্বপ্ন যাহা আমি বিশ্লেষণ করি, তাহাতে এই বিপদ আসিয়া উপস্থিত হয়। আর এক-জনের স্বপ্ন লইয়া যদি বিশ্লেষণ করি, তাহা হইলেও এইরূপ বিপদ আসিয়া পড়ে। আমাকে বিশ্বাস করিয়া যাহারা গুপ্ত কথা বলে, তাহাদিগের সেই কথা প্রকাশ করিলে যদি কোনও অনিষ্ট সম্ভাবনা না থাকে, তবেই তাহাদের স্বপ্নের কথা প্রকাশ করা যায় ; নচেৎ যায় না।

ডাক্তার ফ্রয়েড্ তাঁহার স্বপ্ন বিবরণটি এখানে এইরূপ ভাবেই শেষ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার এই স্বপ্নের বিষয় তাঁহার লেখার অন্যান্য স্থানেও সামান্য সামান্য ভাবে উল্লিখিত আছে। একস্থানে এই স্বপ্নের সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন।—"আমার এই স্বপ্নের কথা বলিতে বলিতে ছাড়িয়া দিতে হইয়াছে ; কারণ তাহার ভিতর এমন কথা আসিয়া পড়ে, যাহা আমি অপরিচিত লোকদিগের নিকট প্রকাশ করিতে পারি না। যদি আমি ঐ স্বপ্ন পরিত্যাগ করিয়া অন্য কোনও স্বপ্ন নির্ব্বাচন করিয়া লইতাম, তাহাতেও বিশেষ সুবিধা হইত না। কারণ, যে কোনও স্বপ্নের

অর্থ পরিস্ফুট নহে, তাহা বিশ্লেষণ করিলে এরূপ কথা আসিয়া পড়ে, যাহা গোপন রাখিতে হয়। কিন্তু যদি আমার স্বপ্নগুলি আমার নিজের জন্যই বিশ্লেষণ করি, তবে তাহাতে কিছু গোপনীয় থাকিলেও যায় আসে না; কিন্তু তাহাতে এমন ভাবগুলির মধ্যে আসিয়া পড়ি, যাহাতে আমি নিজেই আশ্চর্য্য হইয়া যাই।—এই ভাবগুলি আমার নিজের বলিয়া জানিতেই পারি না। শুধু যে সেগুলি আমাদের নিজের স্বভাব-বিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হয় তাহা নহে; উপরন্তু সেগুলি আমাদের অসন্তোষকর,—সেগুলি এরূপ ভাবের যে, আমার বিশেষভাবে প্রতিবাদ করিতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু আবার বিশ্লেষণের সূত্রগুলি ঐ ভাব-সকলকে আমাদের নিজের মনের সহিত দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। এই সব কারণে আমায় স্বীকার করিতে হয় যে, এই ভাবগুলি যথার্থই আমাদের অন্তঃকরণের অংশ; এবং এই-সব ভাবের তীব্রতা এবং শক্তিও কিয়ৎপরিমাণে আছে। কিন্তু মনের একটি বিশেষ অবস্থার জন্য এই সকল চিন্তা সাধারণভাবে আমার জ্ঞানগোচর হয় নাই। আমি এই অবস্থাকে চাপিয়া রাখার অবস্থা (Repression) বলিব। সেইজন্য স্বপ্নের অস্পষ্টতার সহিত এইরূপ মনের চাপিয়া রাখার অবস্থার যে কোনও রকম সম্বন্ধ আছে, এইটি বুঝিয়া লওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব হয় নাই।—এই চাপিয়া রাখার অবস্থার মধ্যে বুঝিয়া লইতে সাধারণ জ্ঞান অক্ষম হইয়াছে, সেইজন্য এইরূপ ভাব লুক্কায়িত রহিয়াছে।

ইহা হইতে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, স্বপ্নের অস্পষ্টতার কারণ এমত একটি ইচ্ছা যে, এইসব চিন্তা যেন গোপন থাকে। ইহাতে স্বপ্নবিকৃতির সম্বন্ধে এইরূপ ধারণা হয়, যেন স্বপ্নের কার্য্য এবং স্বপ্নের ভাব-পরিবর্ত্তন (Displacement) অর্থাৎ স্বপ্নের একটি ভাব সরাইয়া আর একটিকে তাহার স্থানে বসাইয়া দেওয়া, যেন গোপনীয় ভাব-সকলকে প্রচ্ছন্ন রাখিবার জন্যই করা হইতেছে।

আমার নিজের স্বপ্ন সম্বন্ধে পরীক্ষা করিতে আমার নিজেকেই প্রশ্ন করিতে হয় যে, স্বপ্নদৃষ্ট চিন্তাটি কি? যদিও স্বপ্ন বিকৃত আকারে প্রতীয়মান হয়, কিন্তু যথার্থ আকারে উহার মর্ম্মার্থ বোধগম্য হইলে, উহা আমার তীব্র আপত্তির ভাব জাগাইয়া দেয় কেন? আমার মনে হয় যে, আমি বিনামূল্যে মোটর-গাড়ীতে চড়িয়া বেড়াইয়াছিলাম, তাহাতে আমাদের পরিবারস্থ একজনকে শেষবারে যে অনেক পয়সা খরচ করিয়া ভ্রমণ করাইয়াছিলাম, তাহাই মনে পড়িয়াছিল। স্বপ্নের অল্পদিন পূর্ব্বেই ইঁহার জন্য অনেকগুলি টাকা আমার খরচ হইয়া গিয়াছিল। স্বপ্নের অর্থ এই যে, আমি এরূপ ভালবাসা চাহি, যাহার মূল্য-স্বরূপ কিছু দিতে হইবে না। আমার যে কতকগুলি টাকা খরচ হইয়াছিল, তাহাতে আমি অনুতপ্ত, এ ভাব আমার মন হইতে কিছুতেই যায় না। যখন আমি এই ভাব স্বীকার করিয়া লই, তখন আমি বুঝিতে পারি যে, আমি প্রকৃত ভাল-

বাসা চাই, পয়সা খরচ করিয়া যে ভালবাসা পাইতে হয়, তাহা চাই না। তথাপি আমি আমার সম্মানের উপর শপথ করিয়া বলিতে পারি যে, যখন অর্থব্যয় করা প্রয়োজন হইয়াছিল, তখন আমি কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করি নাই। দুঃখ এবং অনুতাপ কৃত-কর্ম্মের বিপরীত ভাব, ইহা আমার নিকট অজ্ঞাত ছিল। কেন এইটি আমার নিকট অজ্ঞাত ছিল, সে পৃথক্ কথা। বিচার-বুদ্ধির সহিত যোগ করিয়া এ প্রশ্নের সম্পূর্ণ উত্তর দিতে পারি না।

নিজের স্বপ্ন বিশ্লেষণ না করিয়া যদি অন্য কাহারও স্বপ্ন বিশ্লেষণ করা যায়, তাহা হইলেও ফল একই হয়। যদি কোনও সুস্থ লোকের স্বপ্ন বিশ্লেষণ করা যায়—তাহা হইলে স্বপ্নের ভিতর যে প্রচ্ছন্ন ভাব আছে, তাহাতে বিশ্বাস উৎপাদন করিবার একমাত্র উপায় এই যে, ইহার দ্বারা স্বপ্নের চিন্তার মধ্যে সামঞ্জস্য দেখাইয়া দেওয়া যায়। অবশ্য ইহা অস্বীকার করিবার তাহার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। কিন্তু যখন আমরা হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি মানসিক বিকারগ্রস্ত ব্যক্তিকে লইয়া এই কার্য্য করি, তখন তাহার প্রচ্ছন্নভাব (Repressed ideas) ধরিয়া লইতে বাধ্য হই; কারণ, এই ভাবের সঙ্গে তাহার পীড়ার লক্ষণের পরিবর্ত্তন হয়।—শেষ যে রোগীর স্বপ্ন বিশ্লেষণ করিয়াছি, সেই রোগীটির কথা বিবেচনা করুন। বিশ্লেষণের দ্বারা বুঝা যায় যে, সে স্বামীর বিষয় বিশেষ ভক্তির সহিত চিন্তা করে না। তাঁহার সহিত বিবাহ হইয়াছে বলিয়া এই স্ত্রীলোকটি দুঃখিত।

তাহার স্বামীর পরিবর্ত্তে আর কাহাকেও যদি স্বামিরূপে পায়, তাহা হইলে যেন সুখী হয়। এ কথা সত্য যে, সে স্বামীকে ভালবাসে বলিয়াই দৃঢ়তার সহিত প্রকাশ করে এবং তাহার জ্ঞানগত দৃঢ় বিশ্বাসও তাহাই। কিন্তু তাহার অন্তঃকরণে বিপরীত ভাবের অস্তিত্ব আছে, তাহা সে জানেই না। তাহার ভাবরাজ্যে পতিভক্তির একান্ত অভাব হইয়াছে। ইহা তাহার ব্যবহারিক জ্ঞানে নাই,—না থাকা ব্যবহারিক জীবনে মঙ্গলজনকও বটে। কিন্তু তাহার স্বপ্ন হইতে যে-সকল সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়, তাহাতে পতিভক্তির অভাবই প্রতিপন্ন হয়। কিন্তু সে ভাব তাহার মনের প্রচ্ছন্ন ভাব—তাহার নিজের নিকটেই অজ্ঞাত। তাহার সেই প্রচ্ছন্ন ভাব পুনঃ জাগ্রত হইয়া তাহার জীবনের এক সময়ের ঘটনা স্মরণ করাইয়া দিয়াছিল। তখন সে বুঝিতে পারিল যে, সে যথার্থই তাহার স্বামীকে ভালবাসে নাই। তখন হইতে তাহার রোগের লক্ষণগুলি অন্তর্হিত হইল এবং তাহার স্বপ্নের ব্যাখ্যা গ্রহণের আপত্তিও অন্তর্হিত হইল।

ডাঃ ফ্রয়েডের নিজদৃষ্ট যে স্বপ্নটির ব্যাখ্যা পূর্ব্বে করা হইয়াছে —তাহাতে যদিও তিনি অনেক কথাই চাপিয়া গিয়াছেন, তথাপি তাহার ব্যাখ্যা হইতে আমরা এই সাধারণ ভাবগুলি বুঝিতে পারি। তিনি কোনও নিকট-আত্মীয়ের জন্য—যাহাতে তিনি দেশ ভ্রমণ করিয়া সুস্থ হইতে পারেন, এ জন্য অনেক অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। যখন তিনি জ্ঞানতঃ এই অর্থ ব্যয় করিতেছিলেন,

তখন তাঁহার নিজের মনের ভাবের কথা বলিয়াছেন যে, যখন আমি ঐ অর্থ ব্যয় করি, আমি আমার সম্মানের উপর শপথ করিয়া বলিতেছি, তখন আমি কিছুমাত্র ইতস্ততঃ বা অনুতাপ বোধ করি নাই। কিন্তু সেই সময়ে তাঁহার মনের মধ্যে এইরূপ ভাব হইতেছিল যে, আমি প্রকৃত ভালবাসা চাই, পয়সা খরচ করিয়া যে ভালবাসা পাইতে হয় তাহা চাই না। হয় ত আমি এত পয়সা খরচ করিয়া এই ব্যবসাদারী ভালবাসাই পাইতেছি, এবং তিনি পয়সা খরচ করিবার জন্য ভিতরে এমন অনুতপ্ত হইয়াছিলেন যে, তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, যে মহাজনের নিকট ধার করিয়া পয়সা খরচ করিতেছিলেন (সম্ভবতঃ তাঁহার নিজের পত্নীর স্বাস্থ্যের জন্যই তিনি অতগুলি অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন) সেই মহাজনের কন্যা যদি তাঁহার পত্নী হইত, তাহা হইলে সব গোল মিটিয়া যাইত।—এইরূপ সামাজিক শিষ্টাচার রক্ষার জন্য যদিও অনেক সময় অর্থব্যয় করিয়া বাহ্যতঃ অনুতপ্ত হই না, তথাপি ভিতরে ভিতরে বেশ একটু আঘাত লাগে—সেই আঘাত প্রায়ই স্বপ্নের ঘটনার মধ্যে প্রকাশিত হয়। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ আমার নিজের একটি স্বপ্ন এখানে উদ্ধৃত করিতেছি।—

স্বপ্নে দেখিলাম, যেন প্রেসিডেন্সি কলেজে করোনেশন দরবার হইতেছে। গেটের ভিতর দিক দিয়া ভিতরে আর অধিক দূর যাইতে পারিলাম না, বাধা পাইলাম। কারণ, সম্মুখে একটি বাঁশের বেড়া বাঁধা রহিয়াছে। জানিলাম—টিকিট কিনিয়া ঢুকিতে

হয়। সঙ্গের একজন লোক দুই পয়সা দিয়া টিকিট কিনিতে গেল। আমি দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া গায়ে কম্বল জড়াইয়া শীতে কাঁপিতে লাগিলাম। বড়ই শীত অনুভব করিতে লাগিলাম। ভিতরে গিয়া দেখিলাম অনেক লোক; বেঞ্চ, ডেস্ক্, ইহা ছাড়া কিছুই দেখিতে পাইলাম না। বাহিরে আসিয়া দেখিলাম—ট্রাম গাড়ী আসিতেছে। টিকিট কেনার জন্য ট্রামের দুই পয়সা কম পড়িয়াছে জানিয়া গেটে কলেজের দারোয়ানের নিকট দুই পয়সা ধার চাহিলাম। দরোয়ান দুই পয়সার স্থলে আমাকে একটি দুয়ানি দিল এবং এরূপভাবে দিল যেন আমার দুই পয়সার স্থলে দুইআনিই লাগিবে।

এই স্বপ্নটি আপাতঃ দৃষ্টিতে একেবারেই নিরর্থক। কিন্তু ডাক্তার ফ্রয়েডের নিয়মানুসারে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলাম—ইহার বর্ণে বর্ণে অর্থ রহিয়াছে।—

প্রেসিডেন্সী কলেজের করোনেশন সভা—এরূপ কোনও সভার কথা আমি জানি না। তবে করোনেশন সভা বলিতে একস্থলে আহুত সৈনিকদিগের উপকারের নিমিত্ত যে 'আওয়ার ডে' (Our day) সভা হইয়াছিল, তাহাই মনে পড়ে। এই Our day সভায় একটি মাঠে আমোদ উৎসবাদি হইয়াছিল, দোকানপাট বসিয়াছিল। এই সব দোকানে সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকেরা এবং সাহেব মেমসাহেবরা পরিচালক ছিলেন। এইদিনে স্থানীয় গভর্ণমেন্ট-স্কুল সুসজ্জিত করা হয় এবং সেখানেও ছাত্রদের সম্মিলন

হইয়াছিল। হয় ত এই স্মৃতিই কতক পরিমাণে স্বপ্নে প্রেসিডেন্সী কলেজে (যে পাঠাগারের সহিত আমি সর্ব্বাপেক্ষা বিশেষ পরিচিত) করোনেশন্ সভার স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছিল।

এইখানে Our day মেলা সম্বন্ধে নিজের একটি ঘটনার উল্লেখ করা প্রয়োজন। মেলাতে আমি ত্রিশ টাকা লইয়া দ্রব্যাদি কিনিতে গিয়াছিলাম। প্রায় সন্ধ্যাবেলা যখন আমি বাড়ী ফিরিতেছি, তখন চারি টাকা মাত্র আমার নিকট অবশিষ্ট। ফিরিবার সময় গেটের নিকট আসিয়া খবর পাইলাম যে, মেলাতে আবার কি নীলাম হইতেছে এবং সাহেবরা আমার খোঁজ করিতেছেন। ফিরিয়া গিয়া দেখিলাম যে, মেলায় বিক্রির পর অবশিষ্ট সামান্য সামান্য যে জিনিষগুলি ছিল, তাহাই অধিক মূল্যে নীলাম করা হইতেছে। আমি সেইখানে উপস্থিত হইয়া এখানকার একটি বৌদ্ধমন্দিরের ছবি নীলাম ডাকিতে লাগিলাম। আমি পূর্ব্বেই মেলাস্থানে এই ছবির একখানি দুই আনা দিয়া কিনিয়াছিলাম। যাহা হউক আমি এই ছবিখানি চার টাকা পর্য্যন্ত নীলামে ডাকিলাম। আমি নামিয়া গেলে সেখানকার খোদ বড়সাহেব বলিয়া উঠিলেন—"বেশ! চার টাকা মাত্র ডাকিয়াই নামিলে কেন? অন্ততঃ ছয় টাকা পর্য্যন্ত ডাকিয়া লও।" আমি কিছু মুস্কিলে পড়িয়া পার্শ্বের সাহেবদিগকে বলিলাম —"আমার নিকট চার টাকার অধিক আপাততঃ নাই। এখানকার বন-বিভাগের প্রধান সাহেব উপস্থিত ছিলেন। তিনি এই

কথা শুনিয়া তুইটি টাকা বাহির করিয়া আমার হাতে গুঁজিয়া দিলেন। এই টাকা দিবার মধ্যে বিশেষ ভদ্রতা ছিল। তিনি এরূপভাবে টাকা গুঁজিয়া দিলেন যে, অন্য কেহ দেখিতে পাইল না। আমিও বড়সাহেবের মেমসাহেব, যাঁহার কর্তৃত্বাধীনে এই নীলাম হইতেছিল, তাঁহার নিকট আমার নিজের মান বাঁচাইয়া ছয় টাকা দিয়া এই ছবিখানি কিনিলাম। এই বন-বিভাগের সাহেবের প্রতি আমি বড়ই কৃতজ্ঞতা অনুভব করিলাম।

প্রেসিডেন্সি কলেজের সভার কথা চিন্তা করিলে আমার তুইটি সম্মিলনীর কথা মনে পড়ে। অধ্যাপক উইলসন্ প্রেসিডেন্সি কলেজে আসিয়া তথাকার একটি বড় ঘরে রঙ্গমঞ্চ স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহারই উৎসাহে এই রঙ্গমঞ্চে একদিন ছাত্রদের আবৃত্তি-পাঠ এবং সেক্ষপীয়র হইতে দৃশ্যাভিনয় হইয়াছিল। আমি ও আমার একজন বন্ধু কিছু কষ্টে টিকিট সংগ্রহ করিয়া এই অভিনয় দর্শন করিতে গিয়াছিলাম। রঙ্গমঞ্চ হইতে কিছুদূরে আমরা স্থান পাইলাম। অভিনয়ের এক বর্ণও আমরা শুনিতে পাইলাম না। আমাদের কিছু অগ্রে একজন মাড়োয়ারী ছাত্র মস্তকে উচ্চ টুপি পরিয়া বসিয়াছিলেন। তাঁহার উচ্চ টুপির জন্য আমরা অভিনেতাদিগকেও ভাল করিয়া দেখিতে পাইতেছিলাম না। তাঁহাকে টুপিটি খুলিয়া ফেলিবার অনুরোধ করিতে তিনি ক্রোধ প্রকাশ করিলেন। এইসব কারণে আমি ও আমার বন্ধু উভয়েই অসন্তুষ্ট এবং বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলাম। আমি আমার

বন্ধুকে কোনও জিনিষের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া বলিতে শুনিয়াছি—“This is not worth two pice.” ইহার মূল্য দুই পয়সাও নহে। স্বপ্নে এই বন্ধু করোনেশন্ সভার জন্য দুই পয়সা দিয়া টিকিট কিনিলেন।

প্রেসিডেন্সি কলেজের সভার কথায় আর একটি সম্মিলনের কথা মনে পড়ে। ইহা যখন আমি প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে যাই। যতদূর মনে পড়ে, পরীক্ষা দিবার সময় আমার প্রেসিডেন্সী কলেজে স্থান নির্ব্বাচিত হয় নাই। মেট্রোপলিটন কলেজে স্থান পড়িয়াছিল। এ দুইটি কলেজের অনেকটা সাদৃশ্য আছে।

প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবার সময় প্রথম দিনে স্থান খুঁজিয়া লইবার জন্য পরীক্ষার অর্দ্ধঘণ্টা পূর্ব্বে কলেজের সমস্ত দ্বার খুলিয়া দেওয়া হইল। স্কুল হইতে এই কলেজরূপ মহারণ্যে প্রথম আসিয়া লোকের ভিড়ে একেবারে দিশাহারা হইয়া গেলাম। বাণবিদ্ধ হরিণের মত কিংবা বৎসহারা গাভীর মত, আমার সিট সন্ধানের জন্য ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিতে লাগিলাম। ইউনিভারসিটি একজামিন দিবার সময় টাকা জমা দিয়া যে রসিদ পাওয়া যায়, সেই রসিদে যে নম্বর থাকে, সেই নম্বর খুঁজিয়া লইয়া, সেই জায়গায় বসিয়া পরীক্ষা দিতে হয়। আমি প্রায় কুড়ি মিনিট কাল ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিয়া প্রায় ক্রন্দনোন্মুখ হইলাম। সারা বৎসরের পরিশ্রম বুঝি বা এই স্থান-সন্ধানের চেষ্টায় বিফল হইয়া যায়। স্বভাবতঃ লাজুক এবং সঙ্কোচময় প্রকৃতির

জন্য কাহারও নিকট সাহায্য চাহিতে পারিতেছি না। এমন সময় একজন যুবক আমার ভাব দেখিয়া আমার অবস্থা উপলব্ধি করিয়া বলিলেন—"আপনি বোধ হয় সিট খুঁজিয়া পাইতেছেন না?" মুখ তুলিয়া তাহার দিকে চাওয়াতে তাঁহার সকরুণ দৃষ্টি আমার হৃদয়পটে অঙ্কিত হইয়া গেল। পঁচিশ বৎসরের ঊর্দ্ধকাল গত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু সে দৃষ্টি এখনও আমার হৃদয়ে জ্বল জ্বল করিতেছে। এই যুবকটি অতি অল্পসময়ের মধ্যেই আমার সিট খুঁজিয়া দিলেন। এই সিট একটি বেঞ্চের নিকট একটি ডেস্ক নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। স্বপ্নে প্রেসিডেন্সি কলেজের ভিতর যে ডেস্ক দেখিয়াছিলাম, তাহার সহিত প্রবেশিকা পরীক্ষার স্মৃতির সংযোগ রহিয়াছে।

প্রবেশিকা পরীক্ষা প্রায় বিয়োগান্ত নাটকে পরিণত হইতে চলিয়াছিল, কেবল দৈববন্ধুলাভে সে বিপদ হইতে উদ্ধার লাভ করিলাম। আওয়ার ডে সভা, যেটি স্বপ্নের বিষয়, তাহাতেও অনেকটা এই ভাব আছে। সেইজন্য এই স্বপ্নের মধ্যে বহু পুরাতন প্রবেশিকা পরীক্ষার স্মৃতিবিন্দু আসিয়া পড়িয়াছে। এই পরীক্ষায় আর একটি দুঃখের কথা মনে পড়ে। বৈকালের পরীক্ষার কাগজে আমার নাম ও নম্বর লিখিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম। সেইজন্য উহার প্রাপ্য নম্বরগুলি আমার মারা যায়।

স্বপ্নে দেখিয়াছিলাম—গেটের ভিতর দিয়া গিয়া আরও যাইতে বাধা পাইলাম, কারণ সন্মুখে একটি বাঁশের বেড়া বাঁধা রহিয়াছে।

যে বেড়াটি দেখিয়াছিলাম, তাহা 'আওয়ার ডে' মেলার জায়গা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। 'আওয়ার ডে' মেলাস্থলে ঢুকিবার পথের প্রথমেই একটি গোলকধাঁধা (Maze) তৈয়ারী করা হইয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীরা জীবনটাকেই একটা গোলকধাঁধা মনে করে এবং তন্নিমিত্ত গোলকধাঁধায় বেড়াইতে ভালবাসে। বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীদের এই প্রবৃত্তি লক্ষ্য করিয়া, পয়সা লইয়া তাহাদের গোলকধাঁধায় বেড়াইতে দিয়া এই মেলার কিছু অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করা হইয়াছিল। স্বপ্নে যে বেড়া দেখিয়াছিলাম, তাহা এই গোলকধাঁধার বেড়ার অনুরূপ।

নিয়ম হইয়াছিল যে, মেলায় ঢুকিবার সময় একটি 'আওয়ার ডে' পতাকা কিনিয়া ঢুকিতে হইবে ; আমি এই নিয়মের বিরুদ্ধে আপত্তি করিয়াছিলাম যে, ইহার জন্য অনেক সাধারণ লোক মেলাস্থলে ঢুকিবে না। 'আওয়ার ডে' পতাকার মূল্য ছিল দুই আনা। কিন্তু স্বপ্নে আমি দুই পয়সা দিয়া টিকিট কেনা দেখিয়াছি। দুই আনা এবং দুই পয়সা এই উভয়ের দুইয়ের অঙ্কে মিল আছে। কিন্তু আনা স্থলে পয়সা হইয়া গেল, ইহার একটি কারণ,—আমার আপত্তি যে, সাধারণ লোকের পক্ষে এত অধিক প্রবেশের মূল্য ধার্য্য করা বিধেয় নহে। এস্থলে কেহ হয় ত প্রশ্ন করিবেন যে, এই দুই পয়সার ব্যাখ্যা প্রেসিডেন্সি কলেজের

ছাত্রদের অভিনয় ঘটনা উপলক্ষ করিয়া একরূপ পূর্ব্বেই হইয়া গিয়াছে। এস্থলে আবার নূতন রকমের ব্যাখ্যা হইতেছে। এই দুই প্রকার ব্যাখ্যার মধ্যে কোন্‌টি গ্রহণ করিতে হইবে? ইহার উত্তরে বলিতে হয় যে, দুই প্রকার ব্যাখ্যাই গ্রহণ করিতে হইবে। স্বপ্নের মধ্যে একটি কৌশল দেখা যায়, তাহাতে এমন চিত্র নির্ব্বাচিত করা হইয়া থাকে যাহার মধ্যে একাধিক ভাবের অভিব্যক্তি থাকে। এই কৌশলের সুবিধা না থাকিলে একটি চিত্রের উপর শাখা প্রশাখা বাহির হইয়া নূতন ভাব প্রকাশিত হয়।

কবিতা, কলা চিত্র এবং রসিকতার মধ্যেও একাধিক ভাবের অভিব্যক্তি স্বপ্নে যেমন দেখা যায়, সেইরূপ অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়। ডাক্তার ফ্রয়েড্ বলেন, মনের যে স্থান হইতে স্বপ্নের উদ্ভব হয়, সেই স্থান হইতে কবিতা রসিকতা ও শিল্পকলার উদ্ভব—ইহাই তাহার কারণ।

মেলাস্থানে যখন গিয়াছিলাম, তখন স্বপ্নে যেরূপ দেখিয়াছিলাম, তদনুরূপ আওয়ার ডে পতাকা কিনিবার জন্য দাঁড়াইতে হইয়াছিল এবং একজন পতাকা কিনিয়া আনিয়া দিয়াছিল। স্বপ্নের এই অংশটি সত্যের অনুরূপ।

এইস্থলে কেহ প্রশ্ন করিতে পারেন যে, স্বপ্নের এই অংশের যখন এরূপ সহজ ব্যাখ্যা রহিয়াছে, তখন প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রাভিনয়, প্রবেশিকা পরীক্ষার ঘটনার মত অবান্তর কথা ইহার সহিত জুড়িয়া দিবার প্রয়োজন কি? উত্তরে বলা যায় যে, স্বপ্নের

কথা ভাবিতে গেলে যেসব ঘটনার কথা মনের মধ্যে স্বতঃই উদয় হয়, সেইরূপ প্রত্যেক ঘটনারই কিছু না কিছু সার্থকতা আছে। স্বপ্নের অধিকাংশ ঘটনা আমাদের পূর্ব্বস্মৃতি,—যাহা কোনও কারণে মনের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া গভীর স্তরে বসিয়া গিয়াছে—তাহাদের সঙ্গে বিজড়িত। এক একটি স্বপ্ন সাধারণতঃ মনের গভীর স্তরের নিহিত এক একটি ভাব লইয়া তাহার চতুর্দ্দিকে গড়িয়া উঠে এবং সেই সময় আমাদের মন হইতে এই সব গভীর স্মৃতির উপকরণ সংগ্রহ করে। এই স্বপ্নেও তাহাই হইয়াছিল। স্বপ্নে প্রেসিডেন্সি কলেজের এবং ডেস্কের চিত্র আনিয়া আমার কৈশোর জীবনের ঘটনা, যাহা সেই সময় বিশেষ আঘাত দিয়াছিল, তাহা যেন এই স্বপ্নের মধ্যে টানিয়া আনিয়াছে এবং এই সব আঘাতের ইঙ্গিতের ভিতর দিয়া, বর্ত্তমান আঘাতের ভাবটিকে ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিতেছে।

স্বপ্নে, গেটের ভিতর দিয়া গিয়া আরও ভিতরে যাইতে বাধা পাইলাম, কারণ সম্মুখে একটি বাঁশের বেড়া রহিয়াছে। ডাক্তার ফ্রয়েড্ দেখাইয়াছেন যে, স্বপ্নের মধ্যে যখন আমরা কোন কার্য্য করিতে গিয়া কোনও বাধা পাই, তাহার অর্থ এই যে আমাদের ইচ্ছার মধ্যে একটি দ্বন্দ্ব রহিয়াছে, প্রবৃত্তির মধ্যে পরস্পর মিল নাই।* বোধ হয় আমার মনের মধ্যে কতকটা সেই রকমই

* The common dream sensation of *movement checked* serves the purpose of representing disagreement of im a conflict of will.—*On dreams* by Prof. Dr. Freu.., translated by M. D. Eder.

হইয়াছিল। এ মেলা উপলক্ষে আমোদ উপভোগ করিবার ইচ্ছাটি বেশ ছিল। নিজের পয়সা খরচ করিবার ইচ্ছাটি বোধ হয় তত ছিল না। ফ্রয়েড বলিয়াছেন যে স্বপ্নে 'এইটি নাই' এইরূপ কথা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। যখন দুইটি ভাবের মধ্যে বিরোধ ঘটে এবং একটি ভাব তাহার বিপরীত ভাবকে উড়াইয়া দিয়া নিজে স্থায়ী হয়, তখন এইটি স্বপ্নে একটি ভারি আশ্চর্য্য উপায়ে দেখান হয়। স্বপ্নের পরে আর একটি স্বপ্নের অংশ যেন পূর্ব্বের স্বপ্নের পরিশিষ্টরূপে দৃষ্ট হয়। ইহাতে পূর্ব্বের স্বপ্নের ঠিক বিপরীত রূপ থাকে। * যে স্বপ্ন বর্ণিত হইতেছে, তাহাতেও এই রকম আছে। এইটি লক্ষ্যের বিষয় যে আমি সবেমাত্র দুই পয়সার টিকিট কিনিয়া সভায় প্রবেশ করিলাম। কিন্তু আসিবার সময় দরোয়ানের নিকট হইতে দুই পয়সার স্থলে দুই আনা লইলাম। ইহার অর্থ এই যে, এই সভায় অর্থ খরচ করার ভাব অপেক্ষা লাভ করার ভাবই জয়লাভ করিল। মেলার মধ্যে ভাগ্য-পরীক্ষার জন্য Lucky Bag ছিল। হয় ত ইহা হইতে আমার লাভ করার ইচ্ছা ছিল। দরোয়ানের নিকট হইতে দুই আনি পাইবার আরও অর্থ আছে। সেগুলি পরে প্রকাশ করা যাইবে।

স্বপ্নে দেখিয়াছিলাম—আমি দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া গায়ে কম্বল

* There seems no 'not' in dreams. Opposition between two ideas, the relation of conversation is represented in dreams in a very remarkable way. It is expressed by the reversal of another part of the dream content just as if by way of appendix.—*Ibid*.

জড়াইয়া শীতে কাঁপিতে লাগিলাম। এইটির কারণ ইহা হইতে পারে যে, তখন গাত্রের লেপ সরিয়া গিয়াছিল, ঐ দেশের অসম্ভব শীতে, কষ্ট পাইতেছিলাম। মনের উত্তেজনাতেও স্বপ্নে এইরূপ দেহানুভূতি হইয়া থাকে। হয় ত মেলার স্বপ্নের মধ্যেও দেহের শীতবোধ এইরূপে মনে প্রতিফলিত হইয়াছিল।

ভিতরে গিয়া দেখিলাম—অনেক লোক, বেঞ্চ, ডেস্ক, ইহা ছাড়া কিছুই দেখিলাম না। এইটি বিরক্তিব্যঞ্জক। কারণ, পয়সা খরচ করিয়া গিয়াছি, অথচ প্রেসিডেন্সি কলেজে যাহা চিরকালই আছে, তাহা ছাড়া নূতন কিছু দেখিলাম না।

স্বপ্নে কিরূপভাবে বিরক্তি এবং ঘৃণা প্রকাশ পায়, সেই সম্বন্ধে ডাক্তার ফ্রয়েডের মতের উল্লেখ এইখানে করা যাইতে পারে। স্বপ্নের মধ্যে অসম্ভব ঘটনা প্রায়ই দেখা যায়। কারণ স্বপ্নের ঘটনা ন্যায়শাস্ত্রের নিয়মাবলীর কোনই ধার ধারে না। কিন্তু ইহা ছাড়াও স্বপ্নের মধ্যে এক প্রকার স্পষ্ট অসম্ভবতা থাকে যাহা ঘৃণা, বিরক্তি, কিংবা মতবিরোধ প্রকাশ করে। স্বপ্নের এই অংশে যে অসম্ভবতার আভাস রহিয়াছে, তাহা এই বিরক্তিব্যঞ্জক।

'আওয়ার ডে' মেলায় যে সাহেব দুইটি টাকা আমাকে হাতে দিয়া আমার মান রক্ষা করিয়াছিলেন, তিনিই স্বপ্নে কলেজের দরোয়ানরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন এবং দুই টাকা স্থলে দুই আনা হইয়া গিয়াছে। সাহেবের এই দরোয়ানরূপে আবির্ভূত হইবার দুইটি কারণ আছে। কারণ উভয়েরই

গোল মুখ ; তাহাতে চেহারার কিছু সাদৃশ্য আছে। দরোয়ানের নিকট ছাতা রাখিয়া কলেজে প্রবেশ করিতে হইত এবং বাহির হইয়া আসিবার সময় ছাতা লইয়া আসিতে হইত। আমি একাধিকবার ছাতার গোলমাল করিয়াছিলাম এবং তাহার মধ্যে দরোয়ানজীর নীরব স্নেহ অনুভব করিয়াছিলাম। এই স্নেহের বিষয়ে দরোয়ানজী এবং সাহেবের মিল আছে। স্বপ্নে দরোয়ানজী আমাকে দুই পয়সা স্থলে দুই আনা ধার-স্বরূপ দিয়াছিলেন এবং এরূপভাবে দিয়াছিলেন যেন আমার দুই পয়সাস্থলে দুই আনাই প্রয়োজন হইবে। স্বপ্নের অবস্থাতে সাহেব দুই আনার ফটোগ্রাফের জন্য দুই টাকা ধার দিয়াছিলেন।

দরোয়ানজী যে দুই আনি দিয়াছিলেন, সেই দুই আনির বিষয়ের সহিত আমার কলেজের জীবনের একটি ভাব জড়িত আছে। আমরা কলেজে প্রবেশ করিবার অল্পদিন পরেই, যে বাঙ্গালী ভৃত্যটি ছাত্রদিগের পানীয় জলের জালা হইতে জল ঢালিয়া দিত, সে বখশিসের দাবী করিয়া বসিল। আমার পকেটে তখন ট্রাম ভাড়ার জন্য একটি দুই-আনি কি চার-আনি ছিল। তাহা তাহাকে দিয়া ফেলিলাম। দুই আনি কি চার আনি দিয়াছিলাম ঠিক মনে নাই—অসন্তোষকর বিষয় লইয়া এইরূপই স্মৃতি-বিভ্রম ঘটে। সেই ভৃত্যটি তাহা পাইয়া কিছু বিরক্ত হইয়া 'ভারি তো দিলেন' বলিয়া পকেটস্থ করিল। এই কথায় আমি একটু আঘাত পাইলাম। আমি যে তাহাকে দুই

আনা পয়সা দিলাম---ইহার ফলে আমাকে ট্রাম ছাড়িয়া এক ক্রোশ রাস্তা হাঁটিয়া বাড়ী যাইতে হইয়াছিল। মনে হইল এই পয়সা এই ভৃত্যকে না দিয়া ট্রামে চড়িয়া বাড়ী যাওয়া উচিত ছিল। স্বপ্নে দরোয়ানজী আমাকে দুই আনা পয়সা ট্রামে চড়িবার জন্য যেন ফেরত দিয়া এই গূঢ় ইচ্ছা পূরণ করিতেছেন। 'আওয়ার ডে'র মেলায় ঐ সামান্য মূল্যের ছবি ছ' টাকা দিয়া কেনাতে খাতিরটা ঐরূপই হইয়াছিল এবং টাকাটি খরচ না করাই ভাল ছিল। পূর্ব্বোক্ত ইঙ্গিত দ্বারা স্বপ্নে এইরূপ অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিতেছে।

'আওয়ার ডে'র ঘটনা লইয়া আমার মনের ভিতর যে ঘাত-প্রতিঘাত হইয়াছিল—আমার মনের মধ্যে আমার অতীত জীবনের ঘটনাগুলির স্মৃতির ইঙ্গিতের দ্বারা সেই সমস্ত ভাবগুলি কিরূপ সুনিপুণভাবে ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছে,—তাহা বিশেষ অনুধাবনের বিষয়।

প্রথমতঃ 'আওয়ার ডে'র ঘটনাটি আমাদের মত রাজকীয় কর্ম্মচারীদের একরূপ পরীক্ষা। স্বপ্নে বেঞ্চ, ডেস্ক, লোকের ভিড় প্রভৃতি এই পরীক্ষার ভাবই ইঙ্গিত করিয়া দিতেছে।

দ্বিতীয়তঃ এই আওয়ার ডের পরীক্ষায় ফল অর্জ্জন করিবার জন্য যেরূপভাবে চেষ্টা করিয়াছিলাম—ঠিক ততখানি যে কৃতকার্য্য হইয়াছিলাম, এ কথা বলিতে পারি না। এই আওয়ার ডের ঘটনাতে আমি যে রাজভক্তি প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, তাহা সফল না হইবার একটি কারণ দৈবনিগ্রহ এবং নিজের

কতকটা বুদ্ধির দোষ। স্বপ্ন-চিত্রের মধ্যে যে প্রবেশিকা পরীক্ষার ভাব আসিয়াছিল, তাহাতেও দৈবনিগ্রহ ও বুদ্ধির দোষে একটি Evening paperএর নম্বর মারা যাওয়ার দুঃখকর স্মৃতি বিজড়িত আছে।

তৃতীয়তঃ কর্তৃপক্ষগণ যদিও 'আওয়ার ডে' মেলাটিকে সুদৃশ্য ও মনোরম করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তবুও ইহা আমার নিকট হট্টগোল বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছিল। এবং শুধু হট্টগোল নয়, এই আওয়ার ডে মেলার সম্বন্ধে আমার এক অপ্রীতিকর স্মৃতি বিজড়িত আছে। স্বপ্ন-দৃশ্যে প্রেসিডেন্সী কলেজের থিয়েটারের মধ্যেও এই ভাব আছে। স্বপ্নে দেখিয়াছিলাম যেন প্রেসিডেন্সী কলেজে করোনেশন্ হইতেছে। কোনও স্কুলের Coronation meetingএ আমি উপস্থিত ছিলাম। সেখানেও একটি অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহার স্মৃতি এখনও আমার মনে আছে। কিন্তু ডাক্তার ফ্রয়েড্ যেমন স্বপ্ন-বিশ্লেষণের সময় কিছু কিছু চাপিয়া গিয়াছেন—আমারও সেইরূপ এই ঘটনা চাপিয়া যাইতে হইল।

চতুর্থতঃ প্রেসিডেন্সী কলেজে ট্রাম-ভাড়ার পয়সা জল-বিতরণ-কারীকে দিলে সে যেমন বলিয়াছিল 'ভারি তো দিলেন', তেম্নি আওয়ার ডে মেলাতেও আমার অতগুলি টাকা চিত্রটির জন্য দিলেও ঠিক এই ভাবটি মেম-সাহেবের মনে হইয়াছিল। এইটি আমার ভিতরের মনের অনুমান।

পঞ্চমতঃ আওয়ার ডে মেলাতে প্রীতিকর ঘটনা এই যে আমার বন্ধুত্ব লাভ ঘটিয়াছিল। যে সাহেব আমাকে দুইটি টাকা অযাচিত-ভাবে দিয়া আমার সম্মান রক্ষা করিয়াছিলেন, তাঁহার সহিত কলেজের দরোয়ান এবং প্রবেশিকা পরীক্ষার যে যুবকটি আমার সিট খুঁজিয়া দিয়াছিলেন—এই উভয়ের তুলনা করা যাইতে পারে। এই তিনজনই একইভাবে আমার উপকার করিয়াছিলেন।

আমার আর একটি স্বপ্ন বিশ্লেষণ করিয়া স্বপ্নতত্ত্ব বুঝাইবার চেষ্টা করিব। এই স্বপ্ন আমি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্বন্ধে দেখিয়াছিলাম। কোন-কোনও ব্যক্তি-বিশেষের নিকটে তিনি যে তাঁহার গুণানুযায়ী প্রিয় হইতে পারেন নাই, তাহারও কিছু কারণ বোধ হয় আমার এই স্বপ্নের ভিতর পাওয়া যাইতে পারে।

স্বপ্নটি এইরূপ—বাড়ীর সম্মুখে যে ফুলবাগান আছে, সেখানে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহার গায়ে গাউনের মত আলখেল্লা। সঙ্গে একটি ব্যাগ। সেই ব্যাগে উদ্ভিদাদি পরীক্ষা করিবার জন্য একটি ছোট মাইক্রস্‌কোপ্‌ এবং ছোট ছোট ছুরি কাঁচি আছে। তিনি এক একটি ফুল ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছেন ও বলিতেছেন যে, এইটি calyx (সবুজ পাপড়ি) এইটি corrolla (রঙ্গীন পাপড়ি)।

এই স্বপ্ন-বিশ্লেষণের জন্য প্রথমতঃ ফুলবাগান সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। আমি যখন এক জায়গায় সিভিল সার্জ্জন হইয়া যাই, তখন একটি সুন্দর সাহেবী ফ্যাসানের সরকারী বাড়ী

অবস্থান করিবার জন্য পাই। এই বাড়ীর সম্মুখেই একটি সুন্দর জাফরির বেড়া-ঘেরা ফুলবাগান ছিল। আমার পূর্ব্ববর্ত্তী সিভিল সার্জ্জন আমাকে বলিয়া গেলেন—"দেখুন, এই বাড়ীর পাশেই সাহেবদের খেলিবার ক্লাব। এইখানে সাহেব মেমসাহেবেরা বৈকালে টেনিস্ খেলেন। সেইজন্য এই বাগানটি বেশ পরিপাটি ও সুন্দর করিয়া রাখিবেন। তাহা না হইলে বাঙ্গালীদের রুচির অখ্যাতি হইতে পারে। আমরা বাঙ্গালীরা এই নতুন সিভিল সার্জ্জনের পদ প্রাপ্ত হইতেছি। যদি এই-সব বিষয়ে পারিপাট্যের অভাব দেখাই, তাহা হইলে সাহেবদের ধারণা হইতে পারে যে, আমরা এরূপ বড় পদের অযোগ্য। বাগান পরিষ্কার রাখিবার জন্য আমার পনের টাকা মাহিনার একজন মালী আছে। আপনিও তাহাকে সেই কাজের জন্য নিযুক্ত রাখিবেন।"

অবশ্য তাঁহার কথায় আমাকে সম্মত হইতে হইল। কিন্তু মাসে মাসে যখন পনের টাকা মালীকে গুণিয়া দিতে হইত, তখন টাকাগুলি অন্যথা খরচ হইতেছে বলিয়া হয় ত মনের মধ্যে দুঃখ হইত।

এই বাগানটি বিলাতী ফুলে ভরা ছিল। গৃহিণীর নিকট শুনিলাম, এ ফুলে দেবপূজা হয় না। তখন এই ফুল তুলিয়া, ছিঁড়িয়া মাইক্রসকোপে পরীক্ষা করিয়া, ফুলের বিভিন্ন অংশ দেখিয়া, সময় কাটাইতাম। হয় ত এই পরীক্ষা করিয়া দেখার মধ্যে আমার কার্য্যের একটি সংজ্ঞা (symbol) জ্ঞাপন করিত।

কারণ, ফুলগুলি যখন বিলাতী, তখন ইহা ছিঁড়িবার এবং বিশ্লেষণ করিয়া দেখিবারই যোগ্য। যদি ফুলগুলি দেশী হইত, তাহা হইলে হয় ত এরূপ হইত না। এই প্রস্ফুটিত ফুলগুলির দিকে তাকাইয়া হয় ত কখনও মনের মধ্যে কবিতার ভাব উদ্রেক করিবার চেষ্টা করিতাম। কিন্তু ভিতরে কবিতার রস মোটেই না থাকায় চেষ্টাগুলি একেবারে নিরর্থক হইত।

স্বপ্ন-বিশ্লেষণ করিয়া বুঝিলাম, স্বপ্নে যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে দেখিয়াছি, তাহা আমার পুত্রকেই ইঙ্গিত করিতেছে। কারণ, আমার পুত্রকে রবিবাবুর শান্তি-নিকেতন আশ্রমে পড়িতে দিয়াছি। সেবার সে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবে। আমার ইচ্ছা ছিল, সে এই পরীক্ষায় পাশ হইলে, যাহাতে ভবিষ্যতে সে মেডিক্যাল কলেজে ডাক্তারি পড়িতে পারে, সেইজন্য তাহাকে I. Sc. ক্ল্যাসে ভর্ত্তি করিয়া দিব; এবং যাহাতে সে I. Sc. classএ Botany, Physiology প্রভৃতি বিষয় পড়ে, তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিব। যখন তাহাকে বোলপুরে ভর্ত্তি করিয়া দিই, তখন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বোলপুর সম্বন্ধে আমার নিকট গল্প করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন—তিনি বোলপুরের ব্রহ্ম-বিদ্যালয় যখন প্রথম প্রতিষ্ঠা করেন, তখন তাঁহার এই ইচ্ছা ছিল যে, যাহাতে বালকগণ দেহে ও মনে সবল ও সুস্থ হয়, তাহার বন্দোবস্ত করিতে হইবে; এবং এইজন্য তিনি কঠিন বিধি নিয়মের মধ্য দিয়া hard trainingএর বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। বোলপুর

তাঁহার পূজনীয় পিতৃদেবের সাধনার স্থান ছিল। তিনিও সেখানে নিজের আধ্যাত্মিক সাধনার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

তিনি তাহার পর ক্রমশঃ বুঝিতে পারিলেন যে, আধ্যাত্মিক বিকাশের দ্বারাই ছাত্রজীবনের যথার্থ বিকাশ হয়—এইরূপ hard trainingএর দিকে চেষ্টা করিয়া বিশেষ লাভ নাই। তিনি ছোট ছোট ছাত্রগণকে উপদেশ দিবার সময়েও তাঁহার আধ্যাত্মিকতার কথা খর্ব্ব করিয়া বলেন না। তাঁহার অনেক কথা, যাহা বোলপুরের বাহিরের লোকেরা বুঝিতে পারে না—এখানকার ছোট ছোট ছাত্রেরা তাহা বুঝিতে পারে। সর্ব্বশেষে তিনি বলিয়াছিলেন—বোলপুরের ছাত্রেরা এখান হইতে যাহা লইয়া যায়, সাধারণতঃ তাহা অন্য স্থানে পায় না। এই শেষ কথাটা আমার মনের উপর গভীর রেখাপাত করিয়াছিল। স্বপ্নে আমার পুত্রকে রবীন্দ্রনাথের রূপে দেখিতে পাইয়াছিলাম তাহার কারণ বোধ হয় এই যে, আমার পুত্র বোলপুর হইতে রবীন্দ্রনাথ যাহা বলিয়াছেন—তাহা লইয়াছে—অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের স্বরূপ যেন তাহাতে প্রকাশ পাইয়াছে।

কিন্তু স্বপ্নের সংজ্ঞার মধ্যে একাধিক ভাব আছে। স্বপ্নে যে রবীন্দ্রনাথের মূর্ত্তি প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহাতে তাঁহার নিজের সম্বন্ধে আমার যে মনোভাব, তাহাও ঐ স্বপ্নের সংজ্ঞার মধ্যে প্রস্ফুটিত আছে।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় একবার খুলনায় যান।

ছেলেদের স্কুলের পারিতোষিক বিতরণের সভায় সভাপতি হইতে তিনি খুব খুশী হন জানিয়া, একটি স্কুলের পারিতোষিক বিতরণের উদ্যোগ করিয়া, তাঁহাকে সেই সভার সভাপতি করা হয়। আচার্য্য রায় ছেলেদের পুরস্কার বিতরণ করিয়া, ছাত্রদিগকে সম্বোধন করিয়া বক্তৃতা দিতে সুরু করিলেন—"হে ছাত্রগণ, তোমাদের মধ্যে যাহারা পুরস্কার পাইয়াছ, তাহারা সুখী হইয়াছ; কিন্তু যাহারা পাও নাই, তাহাদেরও অসুখী হইবার কারণ নাই। কারণ, যাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই, বা বিশ্ববিদ্যালয়কে পদাঘাত করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে অনেকে বড়লোক হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখ—সার আর, এন্, মুখার্জ্জি কিংবা কণ্ট্রাক্টর জে, সি, ব্যানার্জি। ইঁহারা শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হইতে বিশেষ যশের সহিত পাশ করিয়া বাহির হইতে পারেন নাই। কিন্তু তাঁহারা যেমন অর্থোপার্জ্জন করিতেছেন, সেরূপ অর্থ, যাঁহারা যশের সহিত পাশ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যেও কেহ পারিয়াছেন কি না সন্দেহ। কেশবচন্দ্র প্রবেশিকা পরীক্ষায় ফেল করেন, কিন্তু তাঁহার মত বক্তা—যাহারা ভালভাবে পাশ করিয়া বাহির হইয়াছে—তাহাদের মধ্যে মেলে কি? এই শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিলাতে গিয়াছিলেন। সেস্থান হইতে যদি ব্যারিষ্টারী পাশ করিয়া আসিতেন, তাহা হইলেও কি তিনি বেশী বড়লোক হইতে পারিতেন?"

আচার্য্য রায়ের বক্তৃতার এই অংশ শুনিয়াই আমার বক্তৃতার

প্রতি মনোযোগ হঠাৎ যেন বাধা প্রাপ্ত হইল। আমি তখন চোখ বুজিয়া রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ব্যারিষ্টারের গাউনে কিরূপ দেখায় তাহার কল্পনা করিয়া, মানসিক চিত্রাঙ্কনে মনোযোগ দিলাম। বোধ হয় ডাঃ রায়ের বক্তৃতার এই অংশই আমার মনের গভীর স্তরে ঘা দিয়া, মনের ভিতর এই প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছে যে, রবীন্দ্রনাথ যেরূপ হইয়াছেন, তাহা না হইয়া যদি অন্য কিছু হইতেন—তাহা হইলে কিরূপ হইত? স্বপ্নে এই প্রশ্নের মীমাংসা করিবার অনেকটা চেষ্টা আছে। আমার ধারণা, পাশ্চাত্য জগতে গেটের মত সাহিত্যিক আর জন্মায় নাই। কবি গেটের প্রতি আমার শ্রদ্ধার একটি কারণ এই যে, তিনি যেমন কবি ছিলেন, তাঁহার তেমনি বৈজ্ঞানিক অন্তর্দ্দৃষ্টি ছিল। দেহতত্ত্ব (Anatomy) শাস্ত্রে গেটেই প্রথমে আবিষ্কার করেন যে, আমাদের মাথার হাড়গুলি আমাদের মেরুদণ্ডের হাড়গুলির পরিবর্ত্তন হইয়া হইয়াছে। উদ্ভিদ্-বিজ্ঞানের মধ্যে গেটেই প্রথমে আবিষ্কার করেন যে, ফুলের Calyx (সবুজ পাপড়ি), Corrolla (রঙ্গীন পাপড়ি), এইগুলির বৃক্ষের পত্রের রূপান্তর দ্বারাই হইয়াছে। স্বপ্নে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে সবুজ পাপড়ি রঙ্গীন পাপড়ি লইয়া আলোচনা করিতেছেন—তাহাতে মনে হয় যে, যেন আমি আমার ভিতরের মনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতি এই গেটের আরোপ করিতেছি। কিন্তু এই ফুলের পাপড়ি লইয়া বিশ্লেষণ করিবার যে চিত্র দেখিয়াছি, তাহাতে যে তাঁহার উপর

শুধু 'গেটেত্ব' আরোপ আছে, তাহা নয়, রবীন্দ্রনাথ তাঁহার গদ্য ও কবিতার মধ্যে biological philosophy (জীববিজ্ঞান-তত্ত্ব) অনেকখানি আলোচনা করিয়াছেন—সেগুলি যে আমাকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিল, তাহারও ভাব আছে। দৃষ্টান্তস্থলে এই ফুল সম্বন্ধেই তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, তাঁহার লেখা হইতে তাহা উদ্ধৃত করা যাইতে পারে—

"ফুলে দেখা যায় তার পাপড়ির বিস্তার, তার বর্ণের ছটা; ফলে দেখ্‌তে পাই তার বাইরের সঙ্কোচ, তার পাপড়ির খসে পড়া অন্তরের মধ্যে তার বীজের বিকাশ। এই বীজের মধ্যেই ভাবী জীবন নিস্তব্ধ কেন্দ্রীভূত।

তেমনি মানুষ প্রবৃত্তির রাজ্যে বাহিরে আপন রঙ ফলিয়েচে, বাইরে যতদূর পারে আপনাকে সমারোহে বিস্তীর্ণ করেচে। অন্তরে তার সমস্ত উল্টে গেল। বাইরের যে আয়োজন সবচেয়ে বেশী করে চোখে পড়েছিল, সে সবই পাপড়ির মত খসে পড়ল। সেখানে সমস্ত বিক্ষিপ্ত শক্তি সংক্ষিপ্ত হল ভাবী জীবনের একটি বীজের উপর। যেমন তাই হল, অমনি অন্তর রসে ভরে উঠল।"

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আমার ভিতরের গভীর মনে যে সমালোচনার ভাব চলিতেছে, তাহাতে বুঝা যায় যে ইহা আমার নিজের অহঙ্কারের সঙ্গে জড়িত। অর্থাৎ, আমি নিজের অহঙ্কারের ভিতর দিয়া তাঁহাকে দেখিতেছি,—তিনি যে ঠিক কিরূপ, তাহা আমি বুঝিতে ও জানিতে চেষ্টা করিতেছি না। আমি নিজে

ফুল ছিঁড়িয়া মাইক্রসকোপে দেখিতাম—রবীন্দ্রনাথকে দিয়াও তাহাই করিতেছি। আমার নিজের মধ্যে বৈজ্ঞানিকতার গর্ব্ব আছে, গেটের স্বরূপত্ব রবীন্দ্রনাথের উপর আরোপ করিয়া তাঁহাকেও সেইরূপ করিতেছি—অর্থাৎ ঠিক এইরূপ না হইলে আর রবীন্দ্রনাথকে ভাল লাগে না। আমার বোধ হয় যে দেশের মধ্যে তাঁহার সম্বন্ধে মাঝে মাঝে যে বিরূপতা দেখা যায়, তাহাও এইরূপ বিকারসম্ভূত। তাঁহাকে আমাদের নিজের মনের মধ্যে ধরিতে পারি না বলিয়াই তাঁহার উপর বিরক্তি, ক্রোধ এবং বিদ্বেষের ভাব অনেক স্থলে উৎপন্ন হয়।

এইবার আমি অন্যের কয়েকটি স্বপ্নের বিশ্লেষণ করিয়া তাহার ফল লিপিবদ্ধ করিয়া দেখাইতেছি।

(১) একজন ভদ্রলোক পশু বিভাগে (Zoological department) কোনও একটি চাকুরিতে নিযুক্ত ছিলেন। পরে মৎস্য বিভাগের একটি চাকুরিতে নিযুক্ত হন। তিনি একটি স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন; তাহা এই—যেন একটি বিড়াল আসিয়া তাঁহার ঘরের মাছগুলি খাইয়া ফেলিতেছে। তিনি বৈজ্ঞানিক, বুদ্ধিমান লোক,—নিজেই এই স্বপ্ন বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন। যেদিন রাত্রে তিনি এই স্বপ্ন দেখেন, তাহার পূর্ব্বদিন তিনি দেখিয়াছিলেন যে একটি বাঘ, একটি নীল গাই এবং একটি নূতন রকমের গর্দ্দভকে রাস্তা দিয়া আলিপুরের চিড়িয়াখানায় লইয়া যাওয়া হইতেছে। যেদিন স্বপ্ন দেখেন—সেইদিন মাছ যাহাতে পচিয়া না যায় তাহাই

পরীক্ষা করিবার জন্য Smoking process অর্থাৎ ধোঁয়া দিয়া রক্ষা করিবার পরীক্ষায় নিযুক্ত ছিলেন। তিনি তাঁহার চাপরাসিকে এই কাজের দিকে লক্ষ্য রাখিতে বলিয়া অন্য কাজে চলিয়া যান; কিন্তু চাপরাসির ত্রুটিতে মাছগুলি অতিরিক্ত ভাপে পুড়িয়া গিয়া পরীক্ষা নিষ্ফল হইয়া যায়। তাহাতে তিনি অত্যন্ত মনঃক্ষুণ্ণ হন। স্বপ্নে যে বিড়াল দেখিয়াছিলেন, তাহার ইংরাজি হইতেছে cat। Cat কথাটি এই তিনটি কথার আদ্য অক্ষর লইয়া নির্ম্মিত হইয়াছে—Cow, Ass, Tiger। Cow—তিনি যে নীলগাই দেখিয়াছিলেন তাহাকে, ass সেই গর্দ্দভটিকে, এবং tiger সেই বাঘটিকে ইঙ্গিত করিতেছে। তিনি যখন পশু বিভাগে ছিলেন, তখন কিছুদিন একটি সূচীপত্র তৈয়ারী করিয়াছিলেন। তাহাতে পশু, কীট-পতঙ্গাদির নামের আদ্য অক্ষরগুলির প্রতি মনোনিবেশ করিয়া সাজাইতে হইত। স্বপ্নের মধ্যেও এই ভাব সংক্রামিত হইয়াছিল। স্বপ্নে বিড়াল মাছ খাইয়া ফেলিতেছে—ইহার অর্থ এইরূপ বোধ হয় যে—Zoological department (পশু বিভাগ), যদি Fishery departmentকে (মৎস বিভাগ) গ্রাস করিয়া ফেলিত—তাহা হইলে ভাল হইত। কারণ, তাহা হইলে তিনি এই মৎস বিভাগ (যাহাতে তাঁহার মাছ পুড়িয়া যাইবার জন্য হাঙ্গামার মধ্যে পড়িতে হয় এবং যাহার জন্য হয় ত ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর নিকট হইতে দু'কথা শুনিতেও হয়) হইতে তাঁহার

মনোমত Zoological departmentএ (পশু বিভাগ) যাইতে পারেন।

(২) রেলওয়ের একজন ফিরিঙ্গি কর্ম্মচারী তাঁহার একটি স্বপ্নবৃত্তান্ত আমাকে বলেন। তাহা এই—গভর্মেণ্ট যেন একটি চাপরাসিকে দিয়া অনেক স্বর্ণমুদ্রা তাঁহাকে ঘুষ-স্বরূপ পাঠাইতেছেন। তিনি তাহা লইতে চাহিতেছেন না; কিন্তু ইহা যেন ধমক দিয়া তাঁহাকে দিবার চেষ্টা হইতেছে।

হঠাৎ এই ফিরিঙ্গি-কর্ম্মচারীটির এত সাধু ইচ্ছা হইল কেন—তাহা অনুসন্ধানের জন্য আমি স্বপ্নের অর্থ-নির্দ্ধারণের চেষ্টা করিয়া ঘটনাটি শীঘ্রই বুঝিতে পারিলাম। এই ফিরিঙ্গি-কর্ম্মচারীটি বিশেষরূপে মাতাল। তিনি রেলওয়ে Refreshment Roomএর (খাবার-ঘর) এক জায়গায় বসিয়া মদ খাইতেছিলেন। এক পেগ্ মদ খাইয়া ঐ Refreshment Roomএর চাপরাসিকে পুনরায় মদ আনিতে বলিতেছিলেন। চাপরাসি ইতস্ততঃ করিতেছিল—সেইজন্য সাহেবের সহিত বচসা হইতেছিল। এই সময় সেই খাবার-ঘরে একটি স্কটল্যাণ্ড দেশীয় খাঁটি সাহেব প্রবেশ করেন। এই সাহেবটি ফিরিঙ্গি-সাহেবের অধীন কর্ম্মচারী। কথায় কথায় খাঁটি সাহেবটির সহিত ফিরিঙ্গি-সাহেবের বচসা হয়। তাহাতে খাঁটি সাহেবটি ফিরিঙ্গি-সাহেবের নাকে ঘুসি মারিয়া নাক ভাঙ্গিয়া রক্ত বাহির করিয়া দেন। তাহার পর ফিরিঙ্গি-সাহেবটি বাড়ীতে গিয়া চিকিৎসা করান এবং ডাক্তারের certificate লইয়া

গুরুতর আঘাতের দাবি দিয়া ঐ খাঁটি সাহেবটির নামে পুলিসে নালিশ করেন। এক গভর্মেণ্ট কর্ম্মচারীকে অন্য এক গভর্মেণ্ট কর্ম্মচারীর বিরুদ্ধে নালিশ করিতে দেওয়া হইবে কি না, এ সম্বন্ধে তদন্তের ভার পড়ে রেলওয়ে ডিপার্টমেণ্টের উপর। ফলে দুই সাহেবকেই শাস্তি দিয়া দুই বিভিন্ন স্থানে বদলি করা হয়। তাহার পর ঐ ফিরিঙ্গি-সাহেবটিকে, খাঁটি সাহেবের নামে যে মোকদ্দমা রুজু করা হইয়াছে, তাহা তুলিয়া লইবার জন্য বলা হয় এবং তাহা না করিলে যে তিনি আরও শাস্তি পাইবেন এ কথাও তাঁহাকে জানান হয়। ইহাই ফিরিঙ্গি-সাহেবের স্বপ্ন দেখিবার কারণ। স্বপ্নের ভাবটি এই যে, গভর্মেণ্ট যেন ধমক দিয়া তাহাকে অন্যায় কার্য্য করিতে বাধ্য করিতেছেন।

(৩) একজন গৃহস্থাশ্রমত্যাগী যুবক-ব্রহ্মচারী তাঁহাদের আশ্রম-সংক্রান্ত কোনও কার্য্যোপলক্ষে একটি গ্রামে যান। ঐ স্থানে এক অবিবাহিত ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণের বাড়ী তিনি অবস্থান করেন। তাঁহার কার্য্য শেষ হইলেও ঐ গ্রাম হইতে চার পাঁচ ক্রোশ দূরের কোনও দর্শনীয় ধ্বংসাবশেষ দেখিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। হঠাৎ মত পরিবর্ত্তন করিয়া তিনি সেখান হইতে চলিয়া আসেন। যেদিন তিনি চলিয়া আসেন, তাঁহার একটি স্বপ্নের অর্থ বলিয়া দিবার জন্য সেইদিন স্বপ্নটি আমাকে বলেন। স্বপ্নটি এই :— ঘোড়ার উপর একজন চাপিয়াছে, ডান হাতে বল্লম। মুখটা একটা মাঠের দিকে। একজন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে "কি করে

charge করে ভাই ?” সে ঘোড়ার উপর প্রায় শুইয়া বল্লমটা প্রায় সোজা করিয়া ধরিয়া বলিল—“আল্লাহো আকবর।” ঘোড়াটা সোজা ছুটিয়া গেল।

স্বপ্নে আছে—‘মুখটা মাঠের দিকে।’ এখানে মাঠটি মঠের Association word (ভাব-সংহতি)। ঘোড়সওয়ারটি সন্ন্যাসী স্বয়ং। স্বপ্ন-বিশ্লেষণকারীরা জানেন যে বল্লম দিয়া আক্রমণ করা কিংবা ঘোড়ার পিঠে শয়ন করা প্রভৃতি সংজ্ঞা প্রচ্ছন্ন কাম-ভাবকে ইঙ্গিত করে। ঐ শুদ্ধাত্মা ব্রহ্মচারীটির স্বপ্ন দেখিবার আগে কোনও ঘটনাক্রমে মনে হয় যে তাঁহার কোনও খাদ্যদ্রব্য এমন কোন স্ত্রীলোক দ্বারা স্পৃষ্ট হইয়াছে যিনি সর্ব্বতোভাবে শুদ্ধ-স্বভাবা নন। এইটি তাঁহার স্বপ্নদর্শনের কারণ এবং এই কারণেই তিনি শীঘ্র সেস্থান ত্যাগ করেন। স্বপ্নে যে ‘আল্লাহো আকবর’ কথার উল্লেখ আছে, সেইমত তিনি যেন ধর্ম্মভ্রষ্ট হইতেছেন—এই ইঙ্গিত আছে।

(৪) একটি বালিকা তাহার বিবাহের কিছুদিন পরে স্বপ্ন দেখে যে সে মোটরের সিটে বসিয়া যাইতেছে, আর তাহার ছোট ভগ্নী foot-boardএর (পাদানি) উপর বসিয়া আছে। এই বালিকাটি বিবাহের পর মোটরগাড়ী করিয়া শ্বশুরবাড়ী যাত্রা করে। স্বপ্নের ভাব এই যে, তাহার যেমন ভাল বিবাহ হইয়াছে, তাহার ছোট ভগ্নীর সেরূপ ভাল বিবাহ হইবে না।

মনের প্রতিঘাত ও কর্ম্মফল

হিন্দুশাস্ত্রে কর্ম্মফল মানিয়া লওয়া হয়। হিন্দু-শাস্ত্রকারদের মতে, যে যেরূপ কর্ম্ম করিবে, সে এ-জন্মেই হউক বা পরজন্মেই হউক, তাহার ফলভোগ করিবে। মনের ক্রিয়াও নিগূঢ়ভাবে আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, অনেক সময়ে সংসারে যে-সমস্ত দুঃখ-কষ্ট ঘটিয়া থাকে, তাহা অনেকটা স্বখাত সলিলে ডুবে মরার মত অবস্থা। পূর্ব্বকৃত অন্যায় কার্য্য অনেক সময়ে পরবর্ত্তী কার্য্যে এমন এক ভঙ্গী দেয়, যাহা পূর্ব্বকৃত অন্যায় কার্য্যের শাস্তি যেন অনেক স্থলে অনিবার্য্যভাবে আনয়ন করে। সুবিখ্যাত দার্শনিক লেখক এমার্সন তাঁহার আধ্যাত্মিক দৃষ্টি দ্বারা এ-বিষয়ে বিশদ্‌ভাবে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন—

"মানবাত্মার মধ্যে এমন ন্যায়-বিচারের বীজ নিহিত আছে, যাহার ফল সদ্য-সদ্য এবং অমোঘভাবে পাওয়া যায়। যে সৎকাজ করে, সে কৃতকর্ম্মের দ্বারাই মহত্ত্ব প্রাপ্ত হয়; যে নীচ কাজ করে, সে হীন ও সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। যে অপবিত্রতা পরিহার করে, পবিত্র ভাব তাহাকে স্বতঃই অনুপ্রাণিত করিয়া থাকে। অন্তরের সাধুতা হইতেই ঈশ্বরের তুল্যতা লাভ হয়। পরমাত্মার ভিতর যে ন্যায়বিচারের বীজ নিহিত আছে, তাহা হইতেই সে

পরমেশ্বরের বিহিত নিরাপদতা, অমরত্ব ও মহিমার অধিকারী। শঠ ব্যক্তি নিজেকেই প্রতারিত করিয়া থাকে এবং ক্রমশঃ সে নিজের সত্তার সহিতও অপরিচিত হইয়া উঠে। চরিত্র কখনও অজ্ঞাত থাকে না। চৌর্য্যবৃত্তি দ্বারা কেহ ধনী হইতে পারে না, ভিক্ষাদানের দ্বারা কেহ দরিদ্র হয় না। হত্যাকাণ্ড অতি সংগোপনে সংসাধিত হইলেও তাহা প্রস্তরের প্রাচীর ভেদ করিয়া আত্মপ্রকাশ করিবে।”

মনস্তত্ত্বের ঘটনা কথায় বর্ণনা করা অপেক্ষা দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইলে অনেক সময় বিশদ্‌ভাবে বুঝা যায়। ডাক্তার ফ্রয়েডের *Psychopathology of Every-day life* হইতে দুইটি গল্প নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল।

(১) ঘোড়ার গাড়ী হইতে পড়িয়া গিয়া এক যুবতী স্ত্রীলোকের জানুর নীচে পা ভাঙ্গিয়া যায়, এবং ইহার ফলে তাহাকে কয়েক সপ্তাহ শয্যাশায়ী হইয়া থাকিতে হয়। কিন্তু উল্লেখযোগ্য কথা এই যে, ইহাতে সেই স্ত্রীলোকটি কোনরূপ যন্ত্রণা প্রকাশ করে নাই—সে তাহার দুর্ভাগ্য ধীরভাবেই গ্রহণ করিয়াছিল।

এই দুর্ঘটনার পর হইতে তাহার স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যজনিত গুরুতর পীড়া হয়। অবশেষে মানসিক চিকিৎসায় সে আরোগ্য-লাভ করে। চিকিৎসার সময় ঐ দুর্ঘটনাকে ঘিরিয়া যে সমুদায় ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা আমি আবিষ্কার করি; এবং ইহার পূর্ব্বে

এই রমণীর অন্তরে কিরূপভাবে রেখাপাত হইয়াছিল, তাহাও অনুধাবন করিবার চেষ্টা করি। স্ত্রীলোকটি তাহার ঈর্ষা-পরায়ণ স্বামীর সহিত তাহার এক বিবাহিতা ভগিনীর গৃহে অপরাপর ভ্রাতা ভগিনী ও তাহাদের পত্নী ও স্বামীর সহিত কিছুদিন যাপন করে। একদিন রাত্রে এই ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের সমক্ষে সে তাহার নৃত্যকলা প্রদর্শন করে। তাহার সুনিপুণ 'Cancan' নামক নৃত্য দেখিয়া আত্মীয়স্বজনগণ প্রীত হইল বটে, কিন্তু তাহার স্বামী চটিল। সে পত্নীকে চুপি-চুপি জানাইল,—"আবার তুমি গণিকার ন্যায় আচরণ করিতেছ।" এ কথার ফলও ফলিল। সে রাত্রে যুবতীটি নিদ্রাতেও সুস্থির হইতে পারিল না। পরদিন বৈকালে সে অশ্বযানে বেড়াইতে বাহির হইবে মনস্থ করিল। সে নিজেই পছন্দ করিয়া গাড়ীর ঘোড়া ঠিক করিয়া দিল। তাহার কনিষ্ঠা ভগিনী, তাহার শিশু ও শিশুর ধাত্রীকে সঙ্গে লইবার প্রস্তাব করিলে, সে গুরুতরভাবে তাহার অসম্মতি জানাইল। গাড়ীতেও তাহার মানসিক চাঞ্চল্য দেখা গেল। সে শকট-চালককে বলিল,—ঘোড়া ক্রমশঃই অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতেছে; এবং ঘোড়া দুইটি সাময়িক উত্তেজনাবশতঃ একটু অসংযমের ভাব দেখাইতেই, সে ভীত হইয়া গাড়ী হইতে লাফ দিয়া পড়িল, ইহার ফলে তাহার পা ভাঙ্গিয়া যায়। কিন্তু গাড়ীর ভিতরে যাহারা ছিল, তাহাদের কিছুই হইল না। এই ঘটনার বিবরণগুলি জানিবার পর নিঃসন্দেহে বুঝা যায় যে, এই

দুর্ঘটনাটি প্রকৃতপক্ষে স্বকৃত ; আর অপরাধের উপযুক্ত শাস্তি-গ্রহণের ধরণটি দেখিয়াও বিস্ময়ে অবাক হইতে হয়। কারণ, ইহার পর অনেক দিন তাহার পক্ষে 'Cancan' নৃত্য করা অসম্ভব হইয়াছিল।

(২) কোনও মধ্যবিত্ত পরিবারের অন্তর্ভুক্ত এক কন্যার যথাসময়ে বিবাহ হয় এবং যথাক্রমে তিনটি পুত্রকন্যা জন্মে। এই যুবতী স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য-জনিত পীড়ায় অল্প-অল্প ভুগিতেছিল, কিন্তু কোনও চিকিৎসাদি করায় নাই—কেন না, ইহাতে তাহার জীবনযাত্রায় বিশেষ কিছু ব্যাঘাত ঘটিত না। একদিন এই স্ত্রীলোকটি এক অসংস্কৃত রাস্তার উপর হোঁচট খাইয়া পড়ে, এবং পাশের বাড়ীর দেওয়ালে ধাক্কা খাইয়া তাহার মুখে আঘাত লাগে। তাহার মুখখানি ক্ষতবিক্ষত হইয়া যায়, এবং চোখের পাতা নীলবর্ণ হইয়া ফুলিয়া উঠে। চোখের দৃষ্টির যদি কোনও ব্যাঘাত ঘটে, এই ভয়ে সে ডাক্তার ডাকে এবং আমি চিকিৎসার জন্য উপস্থিত হই।

স্ত্রীলোকটি প্রকৃতিস্থ হইলে আমি জিজ্ঞাসা করি—"কেন আপনি এইভাবে পড়িয়া গেলেন ?"

স্ত্রীলোকটি উত্তর করিল—এই দুর্ঘটনার কিছুপূর্ব্বে সে তাহার স্বামীকে সতর্ক হইয়া রাস্তা চলিতে বলে ; কেন না, তাহার স্বামী তখন পায়ের গাঁটের বেদনায় ভুগিতেছিল। সে ইহাও বলিল, প্রায়ই সে লক্ষ্য করিয়াছে যে বিপদের জন্য সে পরকে

সাবধান করিয়া দেয়, ঠিক তাহাই তাহার নিজের বরাতে ঘটিয়া থাকে।

আমি তাহার কথায় সন্তুষ্ট হইতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—ইহা ছাড়া তাহার আর কিছু বলিবার আছে কি না।

স্ত্রীলোকটি বলিল—এই দুর্ঘটনার ঠিক পূর্ব্ব-মুহূর্ত্তে সে একটি দোকানে একখানি সুন্দর চিত্র দেখিতে পায়। ইহা দ্বারা তাহার শিশু-সন্তানের ঘর সাজাইবার জন্য তৎক্ষণাৎ ছবিখানি কিনিবার তাহার ইচ্ছা হয়। সে তখন রাস্তার দিকে লক্ষ্য না করিয়া দোকানটির দিকে অগ্রসর হইতে থাকে, এবং এক পাথরের স্তূপে হোঁচট খাইয়া দেওয়ালের উপর পড়িয়া তাহার মুখে আঘাত লাগে। কিন্তু সে হাত দিয়া আত্মরক্ষা করিবার একটুও চেষ্টা করে নাই। আঘাত প্রাপ্ত হইয়াই তাহার ছবি কিনিবার ইচ্ছা তৎক্ষণাৎ দূর হয় এবং সে বাড়ী ফিরিয়া আসে।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"কেন আপনি আত্মরক্ষার চেষ্টা করিলেন না?"

সে উত্তর করিল—"বোধ হয় ইহা সেই ঘটনার শাস্তি, যাহা আমি আপনার নিকট প্রকাশ করিয়াছিলাম।"

"সে ঘটনার কথা কি এখনও আপনাকে ক্লেশ দেয়?"

"হ্যাঁ। পরে আমি ইহার জন্য অত্যন্ত অনুতপ্ত হই, এবং নিজেকে অপরাধী ও দুর্নীতিপরায়ণ বলিয়া মনে করি।"

এই রমণী যে ঘটনার কথা আমার নিকট উল্লেখ করে, তাহা তাহার গর্ভপাতের বিষয়। ইহা তাহার স্বামীর অনুমতি অনুসারেই করা হয়। কারণ, তাহারা দুইজনেই, আর্থিক অসচ্ছলতার জন্য আর যাহাতে সন্তান না জন্মিতে পারে, সেই ইচ্ছা করিয়া, এরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিল।

স্ত্রীলোকটি বলিল,—"আমি প্রায়ই নিজেকে এই বলিয়া তিরস্কার করিতাম যে, তুই নিজের সন্তানকে হত্যা করিয়াছিস্। আমার সর্ব্বদা ভয় হইত, এ গুরু পাপের শাস্তি আমাকে নিশ্চয়ই ভোগ করিতে হইবে। আপনি বলিতেছেন—আমার চোখে কোনও গুরুতর আঘাত লাগে নাই। এখন আমি এই ভাবিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছি যে, আমার পাপের উপযুক্ত শাস্তিই আমার লাভ হইয়াছে।"

এই দুর্ঘটনা একপক্ষে তাহার পাপের প্রতিফল-স্বরূপ হইতে পারে; অপর পক্ষে যে গুরুতর শাস্তির প্রত্যাশায় রমণী ভীত হইয়া উঠিয়াছিল, ইহা দ্বারা সে তাহার হাত হইতে উদ্ধার পাইয়া গেল, এরূপও হইতে পারে। যে মুহূর্ত্তে সে ছবি কিনিবার জন্য দোকানের দিকে দৌড়িয়া গিয়াছিল, তখনই তাহার পূর্ব্বকৃত অপরাধের স্মৃতি মনের ভিতর জাগিয়া হয় ত এই কথাই বলিবার চেষ্টা করিয়াছিল—"তোমার নিজের শিশুর ঘর সাজাইবার জন্য উদগ্রীব হইতে লজ্জা করে না? তুমি না নিজের সন্তানকে হত্যা করিয়াছ? তুমি হত্যাকারী—তোমার পাপের শাস্তির আর

দেরী নাই।" এই চিন্তা অবশ্য তাহার জ্ঞাতসারে উদিত হয় নাই; এবং এই জন্যই সে পতনের সময় হাত দিয়া আত্মরক্ষা করিবারও চেষ্টা করে নাই।

এইবার যে দেশী ঘটনাগুলির উল্লেখ করিতেছি, তাহা কয়েক-জন ডাক্তারের সম্বন্ধে।

(৩) মফস্বলের কোনও সহরে এক ডাক্তার থাকিতেন। তাঁহার স্ত্রী অতি সুন্দরী, শান্তস্বভাবা ও সুশীলা ছিলেন। কিন্তু ডাক্তারটির চরিত্র কলুষিত। তিনি প্রায়ই রাত্রে বাড়ী থাকিতেন না; অসৎসর্গে রাত্রি যাপন করিতেন। একদিন তাঁহার পত্নী মনের দুঃখে Strychnia (কুঁচিলা বিষ) সেবন করিলেন। যখন সেই বিষের লক্ষণ প্রকাশ পাইল, তখন ডাক্তারের কম্পাউণ্ডার ডাক্তারকে সংবাদ দিবার জন্য বেশ্যাপল্লীতে ছুটিল। কিন্তু, ডাক্তার তখন বোধ হয় সহজ-অবস্থায় ছিলেন না। অনেক অনুনয়-বিনয় সত্ত্বেও তিনি সে রাত্রে বাড়ী ফিরিলেন না। ফলে চিকিৎসার অভাবে সেই রাত্রেই তাঁহার স্ত্রীর মৃত্যু হইল। ডাক্তার-বাবুর ইহার পরও কোনও মানসিক বিকার বা চরিত্র সংশোধিত হইতে দেখা গেল না। যাহা হউক, কিছুদিন পরে তিনি পুনরায় বিবাহ করিলেন। তাঁহার দ্বিতীয়া পত্নী প্রথমা স্ত্রীর ন্যায় সুন্দরী ও শান্তস্বভাবা ছিলেন না বটে, কিন্তু তাঁহার চরিত্রে দৃঢ়তা ও তেজ ছিল। কারণ, তাঁহার আমলে ডাক্তারবাবুর রাত্রে বহির্বাসের অভ্যাস ত্যাগ করিতে হয়। এরূপও শোনা যায় যে,

প্রয়োজন বোধ করিলে এই দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী ডাক্তারবাবুকে দুই এক ঘা প্রহার দিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না।

এই উপলক্ষে প্রেমতত্ত্ব সম্বন্ধে যে বৈজ্ঞানিক আলোচনা হইয়াছে, তাহার একটি কথা মনে পড়িতেছে। বঙ্গ-সাহিত্য আলোচনা করিলে বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরচ্চন্দ্র প্রভৃতি কয়েক-জন প্রতিভাসম্পন্ন সাহিত্যকলাবিদ্ ভিন্ন অপর সাহিত্যিকগণের পুস্তকে প্রেমের এক রকম আলোচনাই দেখিতে পাওয়া যায়। নারীজাতি অতিশয় নম্র, পতিভক্তিপরায়ণা—তাঁহাদের পতিসেবার আদর্শই অনেক স্থলে এই যে, কুষ্ঠরোগাক্রান্ত কামুক পতিরও মনোরঞ্জনার্থ তাহাকে স্কন্ধে করিয়া বেশ্যালয়ে লইয়া যাইতে দ্বিধা করিলে চলিবে না। স্বামী দেবতাকে ঈশ্বরের ন্যায় ভক্তি করিতে হইবে; এমন কি, ঈশ্বরাপেক্ষাও অধিক মান্য করিতে হইবে। তাহার সমস্ত লাঞ্ছনা, অত্যাচার হাসিমুখে সহ্য করিতে হইবে। মোট কথা এই যে, নারীজাতির অন্যায় সহ্য করিবার ক্ষমতা যথেষ্ট থাকিবে; অথচ অন্যায়ের প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতা নীতি-বিরুদ্ধ বিবেচিত হইবে।

কিন্তু বাস্তবতন্ত্রী বৈজ্ঞানিকেরা দেখিয়াছেন যে, সংসারে প্রেমের আর একটি বিভিন্ন প্রকার আছে। স্ত্রীলোকের পক্ষ হইতে এইরূপ বশ্যতার ভাব-প্রকাশে অনেক পুরুষের প্রেমের সম্বর্দ্ধনা হয় না। স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'মৃণালিনীতে' গিরিজায়া ও দিগ্বিজয়ের প্রেম সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, দিগ্বিজয় যেদিন

গিরিজায়ার নিকট সন্মার্জ্জনীর আঘাত না পাইত, সেদিন তাহার মনে হইত, বোধ হয় গিরিজায়ার ভালবাসা লোপ পাইতেছে। এই আলেখ্যের মধ্যে বাস্তবিক সত্যের চিত্র আছে। অনেক পুরুষেরই স্বভাব এইরূপ যে, ভক্তি, মিনতি, স্তব-স্তুতি অপেক্ষা সন্মার্জ্জনীর প্রহার বা তাহার প্রতীক কিছু তাহাদের অন্তরে শান্তি বা তৃপ্তি প্রদান করে, এবং ইহাতেই তাহাদের যথার্থ প্রেমের বিকাশ হয়। ইহার অনেক দৃষ্টান্ত অভিজ্ঞতা হইতে উল্লেখ করা যাইতে পারে।

এক ধনী বিধবা এক পরমা সুন্দরী কন্যার সহিত তাঁহার এক মাত্র পুত্রের বিবাহ দেন। কিন্তু তাঁহার পুত্রের মতিগতি অন্য দিকে যাইতেছে দেখিয়া, সেই বিধবাটি শিক্ষয়িত্রী রাখিয়া তাঁহার পুত্রবধূকে নৃত্যগীতবাদ্যাদি অতি সুন্দররূপে শিক্ষা দেন। তাহার পর পুত্রকে বলেন যে, বধূমাতাই যখন গীত, বাদ্য, নৃত্যে সুশিক্ষিতা হইয়াছে, তখন আমোদ-প্রমোদের জন্য তাহার আর বাহিরে যাইবার প্রয়োজন কি? তাহাতে তাঁহার গুণধর পুত্রটি উত্তর করিল—তাহার স্ত্রী নৃত্যগীতাদিতে সুশিক্ষিতা হইয়াছে বটে, কিন্তু তথাপি সে যে জাতীয় স্ত্রীলোকের সহিত মেশে, তাহাদের মত বাপ-মা তুলিয়া অকথ্য গালিগালাজ করিতে ত আর পারিবে না। শ্বাশুরীটি যদি পুত্রবধূকে শিক্ষিতা করিবার বৃথা প্রয়াস না করিয়া স্বামীকে শায়েস্তা করিবার জন্য সন্মার্জ্জনীর ব্যবহার শিক্ষা দিতেন, তাহা হইলে বোধ করি তাঁহার পুত্রের চৈতন্যোদয় হইলেও হইতে পারিত।

ফ্রান্স দেশে অসচ্চরিত্রা স্ত্রীলোকেরা এক প্রকার রবারের চাবুক রাখে—প্রয়োজন মত তাহারা এই চাবুক ব্যবহারও করে, ফলে তাহাদের প্রতি অনেক প্রণয়ীর না কি আকর্ষণ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

নীতি এবং ধর্ম্মের দিক দিয়া দেখিতে গেলেও, অন্যায়ের প্রশ্রয় দেওয়া বা অন্যায় সহ্য করা যে যথার্থ পতিভক্তির নিদর্শন হইতে পারে, তাহা ভগবানের ন্যায়ধর্ম্মসঙ্গত বিধান বলিয়া মনে করা যায় না। এই ন্যায়ধর্ম্মের আদর্শ আমাদের দেশের স্ত্রীলোকদের মধ্যে প্রচলনের অভাবই স্ত্রীলোকদের আত্মহত্যার বাহুল্যের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। আমাদের দেশে যে কেরো-সিনে কাপড় ভিজাইয়া পুড়িয়া মরা স্ত্রীলোকদের মধ্যে প্রচলিত হইতেছে, ইহার সহিত পূর্ব্বকালের সতীদাহের ভাবসঙ্গতি আছে, এইরূপ মনে হয়। কিন্তু পূর্ব্বকালের সতীরা যে পতির চিতায় আত্মদান করিতেন, এবং রাজপুত-রমণীরা সতীত্বরক্ষার্থ অগ্নিতে আত্মাহুতি দিয়া যে জৌহর ব্রত পালন করিতেন, তাহাতে এক মহৎ আদর্শের প্রেরণা থাকিত। কিন্তু এখনকার আত্মহত্যার মূল কারণ অধিকাংশস্থলেই পতি বা সংসারের উপর বিরাগ। পতিভক্তির এই আদর্শের বিচার—যাহার জন্য স্ত্রীলোকেরা আজকাল আত্মহত্যাজনিত পাপ গ্রহণ করে—তাহার জন্য যে শাস্ত্রকার ও সাহিত্যিকগণ দায়ী নহেন, এ কথা অনেকস্থলেই বলা যায় না। যদি স্ত্রীলোকেরা আত্মহত্যা না করিয়া অন্য কোন

উপায়ে অন্যায় কার্য্যের প্রতিশোধ গ্রহণ বা ঘৃণাজনিত মনের ঝাল মিটাইতে পারিতেন, তাহা হইলে সমাজের, নিজেদের ও দুর্ভাগা পতিদের পক্ষেও মঙ্গলের কারণ হইত। আমরা উপরে যে ঘটনাটি বিবৃত করিয়াছি, তাহা হইতে দুই জাতীয়া স্ত্রীলোকের স্বভাব তাঁহাদের পতির চরিত্রে কিরূপ পার্থক্য উৎপন্ন করে, তাহা বুঝা যায়।

যাহা হউক, দ্বিতীয়বার বিবাহ করিবার পর এই ডাক্তার-বাবুর মতিগতির অনেকটা পরিবর্ত্তন হওয়ায়, তিনি ভদ্রলোকের মত বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার পুত্রকন্যাদিও হইল। ক্রমশঃ তিনি প্রৌঢ়াবস্থায় উপনীত হইলেন। কিন্তু মধ্যে মধ্যে তাঁহার মনে অশান্তির ভাব উদিত হইত। তিনি বলিতেন, Strychnia ঔষধের সম্বন্ধে তাঁহার ভয়ের মাত্রা বেশী হয়। একাকী ঘরে শুইয়া থাকিতে তাঁহার অস্বস্তি বোধ হইত। একদিন দেখা গেল, তিনি Strychnia খাইয়া মরিয়াছেন। যাহারা তাঁহার পূর্ব্ব-ইতিহাস জানিত, তাহারা ইহার কার্য্যকারণ-সম্বন্ধ কিছু বুঝিতে পারিল; কিন্তু সাধারণ লোক বুঝিল, ডাক্তারবাবুর মাথা খারাপ হওয়াতে, ভুল করিয়া ঘুমের ঔষধের পরিবর্ত্তে Strychnia খাইয়া মারা গিয়াছেন।

কাউণ্ট টলষ্টয়, মেরি করেলি প্রভৃতি বিলাতের ঔপন্যাসিকদের গল্পেও অনুরূপ ঘটনার উল্লেখ আছে। কাউণ্ট টলষ্টয়ের একটি গল্পে আছে—একজন যুবক রেলগাড়িতে আসিবার সময় সেই

রেলগাড়িতে একটি লোককে কাটা পড়িয়া মারা যাইতে দেখিতে পায়। যুবকটি অন্য এক বিবাহিতা যুবতীকে তাহার দয়াপরবশতা দেখাইবার জন্য ঐ মৃতব্যক্তির স্ত্রীকে যথেষ্ট অর্থসাহায্য করে। তাহার কপট মহাপ্রাণতায় মুগ্ধ হইয়া সেই যুবতী এই যুবকের সহিত পরিচিত হয়। অবশেষে তাহাদের পরিচয় অবৈধ প্রণয়ে পর্য্যবসিত হইলে, যুবকটি যুবতীকে তাহার স্বামীর নিকট হইতে ভুলাইয়া লইয়া যায়। ইহার পর কোনও একদিন এই যুবতীটি তাহার প্রণয়ীকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য ষ্টেশনে আসিয়া—যে ট্রেণে সেই যুবকটী আসিতেছিল, সেই ট্রেণেই ইচ্ছা করিয়া কাটা পড়িয়া প্রাণত্যাগ করে।

মেরি করেলির একটি গল্পে আছে এক দরিদ্রা বালিকা এক রাজাকে ভালবাসিত; কিন্তু প্রত্যাখ্যাত হইয়া সে জলে ডুবিয়া প্রাণত্যাগ করে। পরিণামে দেখা যায়, ঐ রাজাও যে স্ত্রীলোকের সহিত শেষকালে যথার্থ প্রণয়ে পড়িয়াছিলেন, তাহার মৃতদেহ লইয়া ভেলায় ভাসিতে ভাসিতে সমুদ্রের মধ্যে কোথায় চলিয়া গেলেন—আর তাঁহার কোন সন্ধান মিলিল না।

(৪) কোনও ষ্টেশনে এক ডাক্তার থাকিতেন। সেই ষ্টেশনের ষ্টেশন-মাষ্টারের পুত্রের এক জটিল দীর্ঘকালস্থায়ী রোগ হয়। ডাক্তারবাবু এই ছেলেটিকে প্রত্যহ দেখিতেন। ডাক্তারবাবুর সহিত ষ্টেশন-মাষ্টারের বন্দোবস্ত হয় যে, দরিদ্র বলিয়া তিনি প্রত্যহ ডাক্তারবাবুকে ভিজিটের টাকা দিতে পারিবেন না, তবে

পুত্র আরোগ্য লাভ করিলে একবারে যাহা হয় কিছু দিবেন। ডাক্তারবাবুও ইহাতে সম্মত হইয়াছিলেন। চিকিৎসার জন্য ডাক্তারবাবুর অনেক মূল্যবান্ ঔষধও খরচ হয়। অনেক দিন চিকিৎসার পর রোগীর অবস্থা একবার ভাল, একবার মন্দ হইতে লাগিল। অবশেষে কিছুদিন বিনা ঔষধে থাকিয়া রোগী আরোগ্য-লাভ করে।

পুত্রের আরোগ্যলাভের পর ষ্টেশন-মাষ্টারের সহিত একদিন ষ্টেশনে ডাক্তারবাবুর দেখা হয়। ষ্টেশন-মাষ্টার ডাক্তারবাবুকে বলিলেন,—"আপনি ত ভারি চিকিৎসাই করিলেন। রোগ আপনা-আপনিই ভাল হইয়া গেল দেখিতেছি।" ইহার পর আর ডাক্তারবাবু তাঁহার প্রাপ্য টাকার কথার উল্লেখ না করিয়া কিছু বিরক্তি ও ঘৃণার সহিত ষ্টেশন-মাষ্টারের নিকট হইতে চলিয়া আসেন।

ষ্টেশন-মাষ্টার যে ষ্টেশনে ছিলেন, সেটি বেশ বড় ষ্টেশন। তাঁহার মাহিনা অল্প হইলেও, ঘুষ ইত্যাদি উপরি-পাওনায় বিস্তর লাভ হইত। যাঁহাদের ঘুষ ইত্যাদি লইবার অভ্যাস আছে, তাঁহাদের মেজাজ সাধারণতঃ কিছু ঠাণ্ডা রাখিতে হয়। ষ্টেশন-মাষ্টারেরও এই গুণটি ছিল। কিন্তু ফি না দেওয়া উপলক্ষ করিয়া ডাক্তারবাবুর সঙ্গে তাঁহার যেদিন রূঢ়ভাবে কথা হয়, তাহার কিছুদিনের মধ্যেই একজন গার্ডের সঙ্গে ষ্টেশন-মাষ্টারের বচসা হয় এবং গার্ড তাঁহার নামে রিপোর্ট করিবে বলিয়া চলিয়া

যায়। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও ষ্টেশন-মাষ্টার নরম হন নাই। যাহা হউক, পরে গার্ড রিপোর্ট করে এবং তাহার ফলে ষ্টেশন-মাষ্টার একটি ক্ষুদ্র ষ্টেশনে বদ্‌লি হন। ঐ ষ্টেশনে কোনও উপরি-প্রাপ্তির উপায় ছিল না। ডাক্তারবাবুও কিছুদিন পরে নিকটস্থ কোনও বড় ষ্টেশনে বদলি হন। তিনি একদিন, ষ্টেশন-মাষ্টার যে ষ্টেশনে ছিলেন, সেই ষ্টেশন দিয়া ট্রেনে কোনও স্থানে যাইতেছিলেন। ষ্টেশন-মাষ্টারের মেডিক্যাল সার্‌টিফিকেট লইয়া সেই ষ্টেশন হইতে অন্য একটি ষ্টেশনে বদলি হইবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু ডাক্তারবাবু এমন গম্ভীর ও ঘৃণার ভাব দেখান যে, ষ্টেশন-মাষ্টার মুখ ফুটিয়া মনের কথা বলিতে পারিলেন না। এইজন্য মনে-মনে তিনি রীতিমত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন।

ষ্টেশন-মাষ্টার জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি কোথায় যাইতেছেন ?" তাহাতে ডাক্তারবাবু জানান যে, তিনি কার্য্যস্থল হইতে অল্পদিনের ছুটি লইয়া যাইতেছেন, আবার দিন-কয়েক পরে ফিরিয়া আসিবেন। ইহা শুনিয়া ষ্টেশন-মাষ্টার বলেন যে, তাঁহার কথা মিথ্যা ; কেন না, তিনি যখন এত জিনিষ-পত্র লইয়া যাইতেছেন, তখন আর ফিরিবেন না। দিন-দশেক পর যখন ডাক্তারবাবু ফিরিয়া আসেন, তখন ষ্টেশন-মাষ্টার ষ্টেশনে ছিলেন না। ডাক্তারবাবু যে মিথ্যা কথা বলেন নাই, তাহা প্রমাণিত করিতে একখানি কার্ড ষ্টেশন-মাষ্টারকে দিবার জন্য ষ্টেশনের কোনও কর্ম্মচারীর নিকট দিয়া যান। পরে তিনি জানিতে পারিলেন,

ষ্টেশন-মাষ্টারের অসুখ হইয়াছিল, এবং সেই অসুখেই তাঁহার মৃত্যু ঘটিয়াছে।

এই ঘটনায় প্রথমতঃ দেখা যায় যে, ডাক্তারবাবুর প্রাপ্য টাকা ফাঁকি দিবার মতলবে যেদিন ষ্টেশন-মাষ্টার ডাক্তারবাবুর প্রতি অযথা দোষারোপ করেন, তাহার কিছুদিন পরেই গার্ডের সহিত তাঁহার গোলযোগ হয়—যাহার ফলে তিনি দুর্গম স্থানে বদলি হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন।

এখন গার্ডের সঙ্গে ষ্টেশন-মাষ্টারের যে কলহ হয়, তাহার একটি কারণ এই হইতে পারে যে, ষ্টেশন-মাষ্টার ডাক্তার-বাবুর সহিত ঝগড়া করিয়া যে অন্যায়ভাবে ফাঁকি দিতে যাইতে-ছিলেন, তাহার ফলে তাঁহার মনের ভিতর অযথা ঝাঁঝ জমিয়া গিয়াছিল। কুকর্ম্ম করিবার সময় অনেকেই মনের ভিতর এইরূপ ঝাঁঝের ভাব জমাইয়া লন, এবং একবার ঝাঁঝ জমিয়া গেলে, আত্ম-সংবরণ করাও কঠিন হইয়া উঠে। এদিকে ডাক্তারবাবুর সঙ্গে যখন ষ্টেশন-মাষ্টার ঝগড়া করিতে গেলেন, তখন ডাক্তারবাবু কোনও তর্ক-বিতর্ক করিলেন না, ঘৃণাভরে উপেক্ষা করিয়া চলিয়া গেলেন। ডাক্তারবাবু যদি ঝগড়া করিতেন, তাহা হইলে এই ঝাঁঝ কতকটা খরচ হইয়া যাইত। হয় ত ইহার একটা মীমাংসাও হইতে পারিত। ডাক্তারবাবুকে কিছু অল্পস্বল্প দিয়া একটা রফা হইলে, এই ঝাঁঝের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত হয় ত থাকিত না। কিন্তু তাহা হইল না—মনের ভিতর ঝাঁঝটি পূর্ণভাবে রহিয়া গেল।

তাহার পর ট্রেনের গার্ড আসিয়া তাঁহার সহিত ঝগড়া করিল, তখন তাহারই উপর ঐ ঝাঁঝ পূরাপূরি বর্ষিত হইল। ডাক্তারবাবু অতি সহজে ছাড়িয়া দেওয়াতে ষ্টেশন-মাষ্টারের এই ভুল ধারণা হইয়াছিল যে, গার্ডও তাঁহাকে ছাড়িয়া দিবে। কিন্তু সকলের নিকট হইতে সমানভাবেই উদ্ধার পাওয়া কঠিন। তাহার পর যখন পুনরায় ডাক্তারবাবুর সহিত দেখা, তখনও যদি ষ্টেশন-মাষ্টার নিজের অন্যায় বুঝিতেন, তাহা হইলে মনের ঝাঁঝের যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল, তাহা লোপ পাইয়া যাইত, পুনরায় নূতন রকমের ঝাঁঝ গড়িবার চেষ্টা করিতেন না। অন্ততঃ মরণাপন্ন অসুখের সময় তাঁহার সাহায্যও পাইতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহার অন্যায় কর্ম্মফল তাঁহাকে ক্রমশঃ মৃত্যুর পথে লইয়া গেল।

(৫) মফস্বলের কোনও এক সরকারী ডাক্তার গভর্মেণ্টের নিকট হইতে এই মর্ম্মের এক সার্কুলার পত্র পান যে, সরকারী হাসপাতাল অনেক সময় ভিক্ষুক শ্রেণীর লোক দ্বারা পূর্ণ করা হয়; এ প্রথা গভমেণ্ট সমর্থন করেন না। সরকারী হাসপাতাল পীড়িতদের জন্যই নির্ম্মিত হইয়াছে, এ কথা মনে রাখিতে হইবে। যাহারা খাইতে পায় না, তাহাদের খাইতে দিবার জন্য হাসপাতাল স্থাপন করা হয় নাই। রোগীরা যত পরিমাণে নিজের খাদ্য নিজব্যয়ে সংগ্রহ করিয়া হাসপাতালে থাকিতে পারিবে, এইরূপ রোগীর সংখ্যা যে হাসপাতালে বৃদ্ধি হইবে, সে হাসপাতালের পরিচালনা ততই ভাল হইতেছে—সরকার

বাহাদুর তাহাই মনে করিবেন। ডাক্তারবাবুর যতদূর স্মরণ হয়, সার্কুলারটি এইরূপ ছিল।

ঐ সার্কুলার যেদিন সেই ডাক্তারটির হস্তগত হয়, তাহার দুই-একদিন পরেই একটি পশ্চিমদেশীয় যুবক সেই ডাক্তারখানায় উপস্থিত হয়। যুবক ডাক্তারবাবুকে বলে যে, সে দেশ হইতে চাকুরীর চেষ্টায় এখানে আসিয়াছিল, কিন্তু চাকুরী পাওয়া দূরে থাকুক, তাহার দুইদিন আহার পর্য্যন্ত জোটে নাই। তাহাতে সেই ডাক্তারবাবু সরকারী সার্কুলারের কথা মনে করিয়া বলেন যে, এরূপ লোককে হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হয় না। তখন সেই লোকটি খাইবার জন্য কিছু ভিক্ষা চায়। ডাক্তারবাবু তাহাকে জানান যে, সবডিভিসনাল অফিসারের নিকট Poor Fund (দরিদ্র-ভাণ্ডার) এর টাকা আছে, সে সেখানে গেলে খাইবার জন্য ভিক্ষা পাইতে পারে। নিজে তিনি কিছু দিয়াছিলেন কি না, তাঁহার মনে নাই। মনস্তত্ত্বের নিয়মানুসারে এরূপ অসন্তোষকর স্মৃতি মনের ভিতর থাকে না—আপনা আপনি বিলুপ্ত হইয়া যায়; এবং সম্ভবতঃ ডাক্তারবাবু উপদেশ ছাড়া পয়সা দিয়া ঐ বুভুক্ষু লোকটির কোনও উপকার করেন নাই। পরদিন পুলিস একটি মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদ দ্বারা পরীক্ষা করিবার জন্য ডাক্তারবাবুর নিকট প্রেরণ করে। সেই লাসটি রেলওয়ে লাইনে কাটা কোনও এক ব্যক্তির। লাসটি পরীক্ষা করিয়া ডাক্তারবাবু স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন যে, এই লোকটি ট্রেন আসিবার সময় রেলওয়ে লাইনের উপর গলা রাখিয়া

আত্মহত্যা করিয়াছে। শব-ব্যবচ্ছেদ করিয়া ইহাও বুঝা গেল যে, লোকটির দুই-একদিন অন্নও জোটে নাই। মৃতব্যক্তির মুখ দেখিয়া ডাক্তারবাবু বুঝিলেন যে, যে-লোকটি পূর্ব্বের দিন অন্ন জোটে নাই বলিয়া হাসপাতালে ভর্ত্তি হইতে আসিয়াছিল, এ লোকটি সেই। ডাক্তারবাবু তাঁহার কার্য্য, অর্থাৎ শব-ব্যবচ্ছেদ, রিপোর্ট লেখা প্রভৃতি শেষ করিয়া ফেলিলেন। তাঁহার মনের ভিতর যে দুঃখ ও অনুতাপ হইতেছিল, তাহা মুছিয়া ফেলিবার জন্য এই ঘটনার কথা চাপা দিবার চেষ্টা করিলেন। নিজেকে বুঝাইলেন, ইহাতে তাঁহার আর বিশেষ দোষ কি? তিনি সরকারী নিয়ম পালন করিয়াছেন,—যাহাতে তাহার অন্নসংস্থান হইতে পারে, সে বিষয়েও উপদেশ দিয়াছেন। লোকটি যদি নির্ব্বোধ হয়, তাহা হইলে সে জন্য তিনি দায়ী নহেন। নানা কাজের মধ্যে তিনি এ ঘটনার কথা মন হইতে অন্তর্হিত করিলেন। কিন্তু বোধহয় তাঁহার ভিতরের মন হইতে সে কথা একেবারে লুপ্ত হইল না। কারণ, যখন তিনি রেলওয়ে ষ্টেশনে গাড়ীর জন্য অপেক্ষা করিতেন এবং ট্রেন যখন সশব্দে আসিত, তখন তিনি একপ্রকার স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের ভাব বোধ করিতেন—ট্রেণের খুব নিকটে গিয়া দাঁড়াইতে পারিতেন না। তাঁহার মনে হইত, যেন ট্রেন তাঁহাকে টানিয়া লইয়া চাকার তলে ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে। তিনি মধ্যে মধ্যে হত্যার স্বপ্ন দেখিতেন। নিম্নে একটি স্বপ্নের বিবরণ দেওয়া গেল।

তিনি স্বপ্নে দেখিলেন, যেন তাঁহার ভগিনী একটি নদীতে স্নান করিতেছে। তিনি ঘাটের উপর দাঁড়াইয়া পাহারা দিতেছেন। বাড়ী হইতে নদীর ঘাটে আসিবার জন্য যেন একটি বাঁশের সেতু আছে। এই সেতু দিয়া যেন একটি সাহেব-ডাকাত তাঁহার ভগিনীকে আক্রমণ করিবার চেষ্টা করিতেছে। তাহা দেখিয়া ডাক্তারবাবু ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। তিনি তাঁহার ভগিনীকে রক্ষা করিবার জন্য বাঁশের সেতুর উপর উঠিয়া এই সাহেব-ডাকাতের আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার চেষ্টা করিলেন। ডাক্তারবাবু দেখিলেন, তাঁহার হাতে একটি ডাক্তারি ছুরি রহিয়াছে। সেই ছুরি তিনি ডাকাতের বুকে বসাইয়া দিলেন। ডাকাত আহত হইয়া সেতু হইতে মাটিতে পড়িয়া মরিয়া গেল। ডাক্তারবাবু তখন বড়ই ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন, ভাবিলেন, এখন এই মৃতদেহটি লইয়া কি করিবেন। তাঁহার উপর ত খুনের দায় চাপিল। এই মৃতদেহ-সমেত ধরা পড়িলে তাঁহাকে ফাঁসি যাইতে হইবে। তিনি স্বপ্নে হত্যাকারীর যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিলেন। ইহার পরই তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। ঘুম ভাঙ্গিবার পরও তাঁহার মনে উত্তেজনার কষ্ট রহিল—তিনি দেখিতে পাইলেন, এই দুঃস্বপ্নের জন্য তিনি ঘর্ম্মাপ্লুত হইয়াছেন।

উপরিউক্ত স্বপ্নটি সম্পূর্ণভাবে বিশ্লেষণ করিবার এখানে প্রয়োজন নাই; তবে কিছু কিছু বিশ্লেষণ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। প্রথমতঃ বাঁশের সেতু। ইহা হইতে এই ঘটনার কথা

মনে হয়—ডাক্তারবাবু একবার নৌকা করিয়া মফস্বলে গিয়াছিলেন। মফস্বল হইতে ফিরিবার সময় নৌকার মাঝিরা বলিল যে, এখান হইতে নৌকায় বাড়ী যাইতে হইলে দেড় দিন লাগিবে; কিন্তু হাঁটিয়া যাইতে ৪।৫ ঘণ্টার বেশী লাগিবে না। সেদিন জ্যোৎস্না রাত্রি ছিল। জিনিষ-পত্র লইয়া মাঝিদের জলপথে রওনা হইতে বলিয়া ডাক্তারবাবু হাঁটিয়া বাড়ী যাইবার জন্য নৌকা হইতে অবতরণ করিলেন। অর্দ্ধেক রাস্তায় আসিয়া দেখিলেন—নদী পার হইবার জন্য যে কাঠের সেতু ছিল, তাহা মেরামত করিবার জন্য কাঠগুলি তুলিয়া লওয়া হইয়াছে এবং লোকজনের পারাপারের জন্য একটি অস্থায়ী বাঁশের সেতু করিয়া দেওয়া হইয়াছে। যদিও সেই সেতুর উপর দিয়া সাধারণ লোক নগ্নপদে অনায়াসে চলিয়া যাইতে পারে, কিন্তু অনভ্যস্ত লোকদিগের পক্ষে, বিশেষতঃ জুতা পায় দিয়া, সেই বাঁশের সেতুর উপর দিয়া পার হওয়া বড়ই বিপদসঙ্কুল। নীচে বেগবতী ভীষণ নদী—তাহার ভিতর একবার পড়িলে মৃত্যু নিশ্চিত। কিন্তু তখন আর কোনও উপায় ছিল না। নৌকাও ঘাট হইতে রওনা হইয়া গিয়াছে। এই সেতু না পার হইলে রাত্রে বাড়ী পৌঁছিবার কোন সম্ভাবনাই নাই। অগত্যা ডাক্তারবাবুর সঙ্গে যে লোক ছিল, তাহার সাহায্যে সেতু পার হইলেন। কিন্তু এই নদী পার হইবার সময় তাঁহার মনে হইয়াছিল যে, বাড়ীতে এত তাড়াতাড়ি আসিবার কি প্রয়োজন ছিল। রাত্রের মধ্যে বাড়ী না পৌঁছিয়া পরের দিন পৌঁছিলেই কি

মহাভারত অশুদ্ধ হইয়া যাইত? স্বপ্নদৃষ্ট সেতুর সঙ্গেও এই ভাব জড়িত ছিল।

সাহেব-ডাকাতের ঘটনায় ডাক্তারবাবুর আরও অনেক ঘটনা মনে পড়িল। তবে বিশেষভাবে যে ঘটনাটি মনে পড়ে তাহা এই। তিনি তাঁহার স্ত্রীকে লইয়া একবার ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম্ দেখিতে গিয়াছিলেন। জীবতত্ত্ব-বিভাগে তাঁহার স্ত্রীকে তন্ময়ভাবে জীব-বিজ্ঞানের বিষয় বুঝাইতেছিলেন, এমন সময় সম্মুখে নজর পড়ায় দেখিলেন যে, একটি ফিরিঙ্গি-সাহেব নিকটে দাঁড়াইয়া তাঁহার স্ত্রীর দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিয়াছে। ইহা তাঁহার নিকট বিশেষ কুৎসিত বলিয়া বোধ হওয়ায় তাঁহার সর্ব্বশরীর জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু স্ত্রীলোক সঙ্গে থাকাতে তিনি সাহেবকে কিছু বলিতে পারিলেন না—মনের রাগ মনেই চাপিয়া সেখান হইতে চলিয়া আসিলেন। স্বপ্নে সাহেব হত্যা করিয়া বোধ হয় এই রাগের ঝাল মিটাইতে চাহিতেছিলেন। বোধ হয় সাহেবের ব্যবস্থার জন্যই সেই পশ্চিমদেশীয় লোকটির মৃত্যু ঘটিয়াছিল—তিনি নিজের মনকে এই কথা বুঝাইয়াছিলেন। স্বপ্নের এই চিত্রে তাহারই ইঙ্গিত ছিল।

তাঁহার হাতে যে ডাক্তারি ছুরি ছিল, তাহাতে প্রায় সকল ডাক্তারের ভাগ্যে যাহা ঘটে, অর্থাৎ operation was successful but the patient died,—অস্ত্রোপচারটি ঠিকই হইয়াছিল, তবে ইহার দরুণ তাহার মৃত্যু ঘটিয়াছিল, এইটি যাহা এইরূপ স্মৃতি

জড়িত ছিল। এইরূপ স্বপ্নের প্রায় সব কয়টি ঘটনাই জীবনের অপ্রীতিকর ঘটনার দ্যোতক এবং এই স্বপ্নদর্শনকারীর ভিতরের মনে যে অশান্তির সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহাই সূচিত করিতেছিল।

ইহার পরে ঐ সরকারী ডাক্তারটি অল্পদিনের জন্য মেডিক্যাল কলেজের হাসপাতালের কোনও কাজে বদ্‌লি হন। এই সময় মেডিক্যাল কলেজের সম্মুখে ট্রামের রাস্তার উপর ট্রাম চালাইবার জন্য যে বৈদ্যুতিক তার আছে, সেইটি ছিঁড়িয়া পড়ে। এই ঘটনা দেখিবার জন্য সেই ডাক্তার অন্য একটি ডাক্তারের সহিত রাস্তায় উপস্থিত হন। সেই সময় ঐ রাস্তায় একটি জুড়িগাড়ী বেগে দৌড়িয়া আসিতেছিল। ইহার গতিরোধ করিবার কোন উপায় ছিল না। জুড়িগাড়ী তারের নিকট পৌঁছিলে, একটি ঘোড়ার পা যেমন বৈদ্যুতিক তারে স্পৃষ্ট হয়, অমনি বৈদ্যুতিক আঘাত লাগিয়া পড়িয়া যায়। জুড়িগাড়ীও উল্টাইয়া পড়িতে পড়িতে বাঁচিয়া যায়। গাড়ীর পাশে একটি লোক আসিতে-ছিল, সেও চাপা পড়িতে পড়িতে বাঁচিয়া যায়। এইরূপ অবস্থা দেখিয়া ডাক্তারবাবু বড়ই চঞ্চল হইয়া পড়িলেন। হয় ত রেলগাড়ীতে কাটিয়া যে লোকটি মরিয়াছিল, তাহার স্মৃতির খোঁচা মনের মধ্যে জাগিয়া উঠিল। তাঁহার অজ্ঞাতসারে বোধ হয় এইরূপ ভাব হইল যে, তাঁহারই দোষে একটি লোক রেলে কাটা পড়িয়া মরিয়াছে। এখন যাহাতে আর কেহ না মরে, এরূপ কাজ করিয়া পূর্ব্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করা যায় কি না ?

এসব কথা হয় ত তাঁহার জ্ঞানের চিন্তার ভিতর দিয়া প্রবাহিত হয় নাই। তিনি তাঁহার সঙ্গী ডাক্তারটিকে বলিলেন যে, কম্বল non-conductor, ইহা বিদ্যুৎপ্রবাহ রোধ করে; একটি কম্বল পাইলে তারটি ধরিয়া সরাইয়া দেওয়া যাইত। এই কথাগুলি যে তিনি পরোপকার কিংবা অসীম সাহস-প্রদর্শনের জন্য বলিয়াছিলেন, তাহা মনে হয় না। তাঁহার মনের ভিতর যে একটি খোঁচা ছিল, তাহা হইতে অন্তরে যে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইয়াছিল, সেই দ্বন্দ্বের ফলে যেন কতকটা অজ্ঞাতসারেই কথাটা মুখ দিয়া বাহির হইয়াছিল।

হয় ত তাঁহার সঙ্গী ডাক্তারটি তাঁহার কথার এই প্রত্যুত্তর দিতেন যে, দেখুন, অমন পাগলামিতে কাজ নাই। সম্মুখে অতবড় ঘোড়া এই তারের সংস্পর্শে ঐরূপ আহত হইয়া পড়িয়া গেল—আর আপনি তাহা সরাইবার ইচ্ছা করিতেছেন। কিন্তু সে ডাক্তারটি বিভিন্ন প্রকৃতির লোক। এই গল্পটি যে কাল্পনিক নয়, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য বলা যাইতে পারে যে, ইনি কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ বিলাত-ফেরত ডাক্তার—বিধানচন্দ্র রায়।

ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় এই বয়োজ্যেষ্ঠ ডাক্তারটির কথা শুনিয়া হাসপাতাল হইতে একটি কম্বল আনিয়া তাঁহার হাতে দিলেন। ডাক্তারবাবু ঐ কম্বল দিয়া তারটি জড়াইয়া উহা সরাইবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু তাঁহার স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য বেশী ছিল বলিয়া তাঁহার তার সরাইবার চেষ্টা সফল হইল না। তখন বিধানচন্দ্র

নিজেই কম্বল লইয়া বেশ শৃঙ্খলার সহিত তারটি ধরিয়া রাস্তার এক পাশে সরাইয়া আনিলেন এবং মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র আনিয়া তার পাহারা দিবার জন্য ডিউটিতে বসাইয়া দিলেন। যাহা হউক, সেই ডাক্তারবাবুর মনের ভিতর যে খোঁচা ছিল, তাহা এই তার সরাইবার উপলক্ষে দুরীভূত হইল। এই কাজ করিবার জন্য তাঁহার মনে যে এক অপূর্ব্ব আনন্দের সঞ্চার হইল, তাহাতে পূর্ব্বজীবনের কষ্টের সমুদায় স্মৃতি মুছিয়া গেল।